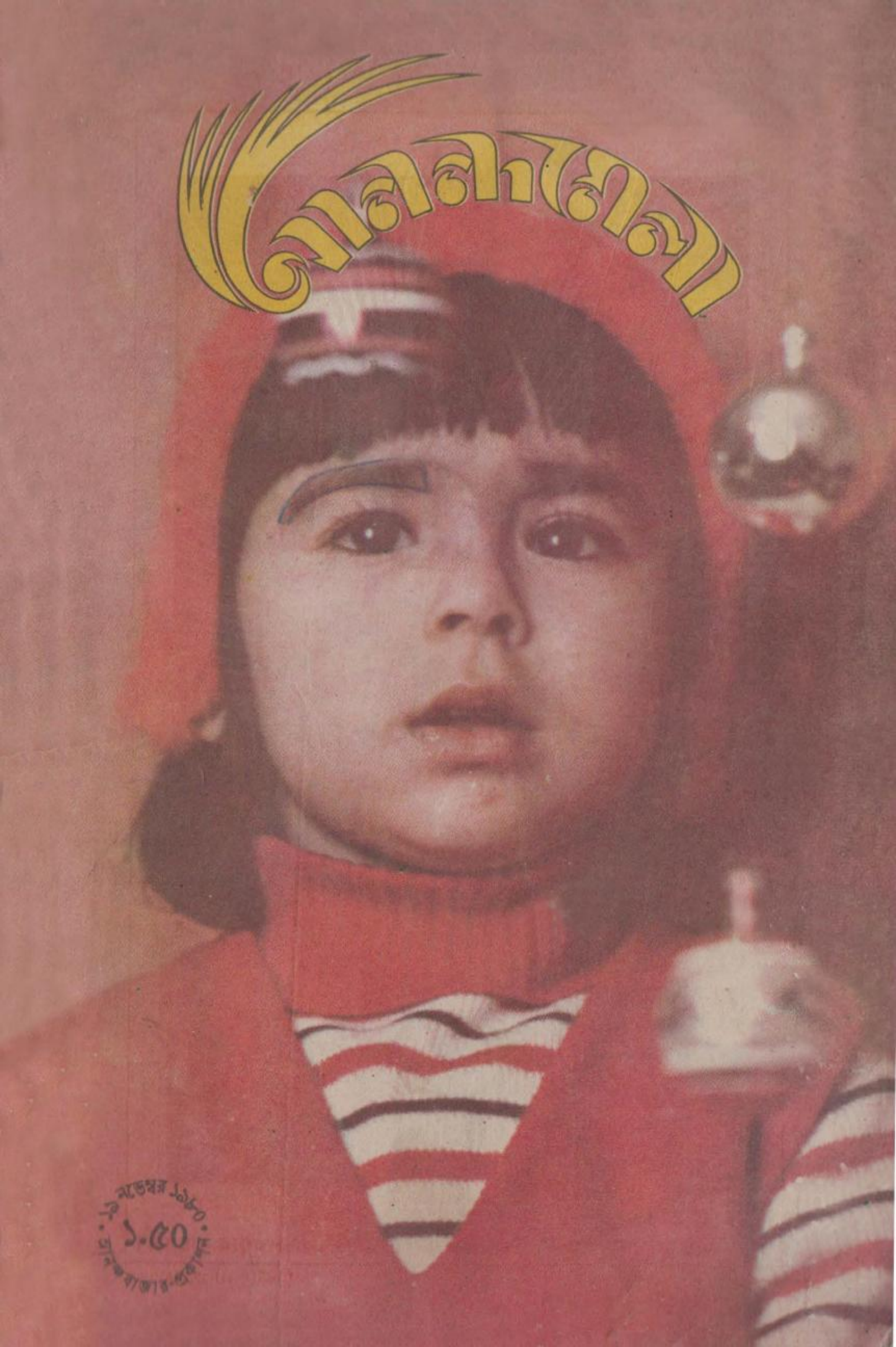
আনন্দমেলা
৭ নভেম্বর ১৯৮০ • আনন্দবাজার প্রকাশন •
১.৫০

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে,
এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

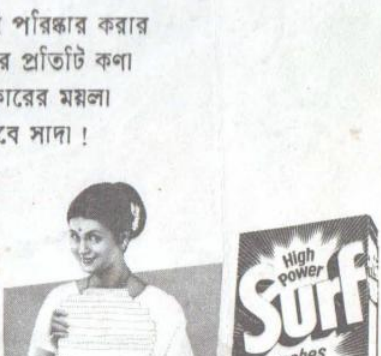

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড়
ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন — লিনটাস-SU-220-1810 BG

ক্লিয়ারাসিল এবার এক নতুন অন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যাকে

তরুণ মুখকে সুন্দর রাখতে ক্লিয়ারাসিল,
ব্রণ সাফ করে দেয় ও তা ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়
ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফর্মুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়
ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য করে, ফলে ক্ষতিকর ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

ব্রণ হ'ল যৌবনে পা রাখার এক অঙ্গবিশেষ—
তখন আপনার চাই সামান্য একটু ধৈর্য্য…
আর ক্লিয়ারাসিল!

ক্লিয়ারাসিল বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM-5071-BN

আনন্দমেলা

৩ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ • ১৯ নভেম্বর ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ১৬ সংখ্যা

বড় গল্প
দুইজন সন্ধানী । সমরেশ মজুমদার ১০
গল্প
আজব জিনিস । তারাপদ রায় ৩১
অভিমান । গৌরী সেন ৪৪
উপন্যাস
কে । বিমল মিত্র ২৬
রুকু-সুকু । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৭
স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৬
ভ্রমণ-কাহিনী
পালামৌ অভয়ারণ্যে । দেবপ্রসাদ পুরকায়স্থ ৪
খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি.কে.) ৪২
ছড়া
ভূতের মুণ্ডু । সুরজিৎ ঘোষ ১৯
মাৎস্যন্যায় । সৌরেন বসু ৩৩
হিপোর হাঁচি । শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
পুতুল-মাসি । সলিল বসু ৪৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪
খেলাধুলো
আলি হেরে গেলেন । শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৫০
আবার গাভাসকার । অভিমন্যু ৫৩
লম্বা খেলোয়াড়ের সুবিধে । চিরঞ্জীব ৫৪
উইল্স ট্রফি । অলোক দাশগুপ্ত ৫৫
লেখাপড়া
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫৯
মেট্রোপলিটানের (মেন) প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৬২
ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট বয় ৬৩
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪৩
তোমাদের পাতা ৪৭, আঁকো-শেখো ৬৬
মহম্মদ আলির পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯
প্রচ্ছদ জে বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশনস (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

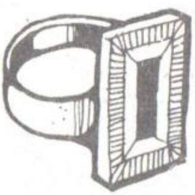

আগামী সংখ্যা থেকে
বিমল করের
দারুণ রোমাঞ্চকর উপন্যাস
সিসের আংটি
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
একেবারে শুরুর থেকেই
পড়তে শুরু করো।

আগামী সংখ্যা থেকে
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
হাসির-তুফান-তোলা উপন্যাস
হারানো কাকাতুয়া
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।
একেবারে শুরুর থেকেই
পড়তে শুরু করো।

পালামৌ অভয়ারণ্যে

দেবপ্রসাদ পুরকায়স্থ

রাঁচি হয়ে বেতলাতে পালামৌ ন্যাশনাল পার্কে পৌঁছনো গেল। সঙ্গে রয়েছে জনা-পঁয়ত্রিশ ছেলেমেয়ে, তাদের পিঠে রুকস্যাক, পায়ে জঙ্গল বুট। কলকাতা থেকে সবাই এসেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের (পূর্বাঞ্চল শাখা, ভারত) 'প্রথম প্রকৃতি পরিচিতি শিবির'-এ যোগ দিতে।

বেতলা জায়গাটি ছোট। জনবসতি খুব কম। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বনবিভাগের কর্মী।

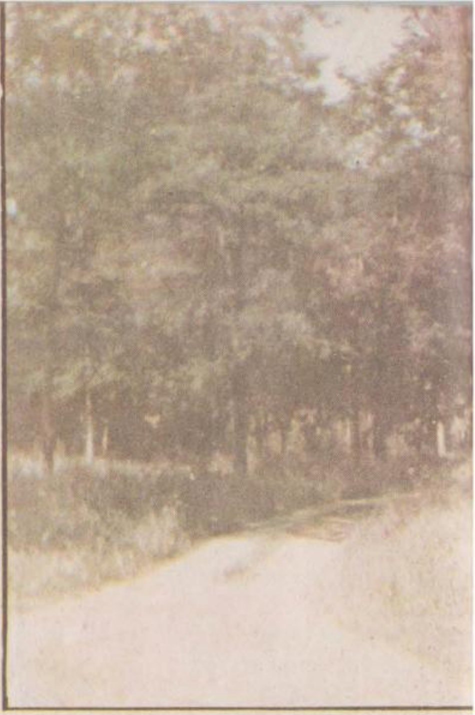

অভয়ারণ্যের পথ

চিতল-হরিণদের দলবদ্ধ জলপান

বনে বিচরণ করছে একদল চিতল-হরিণ

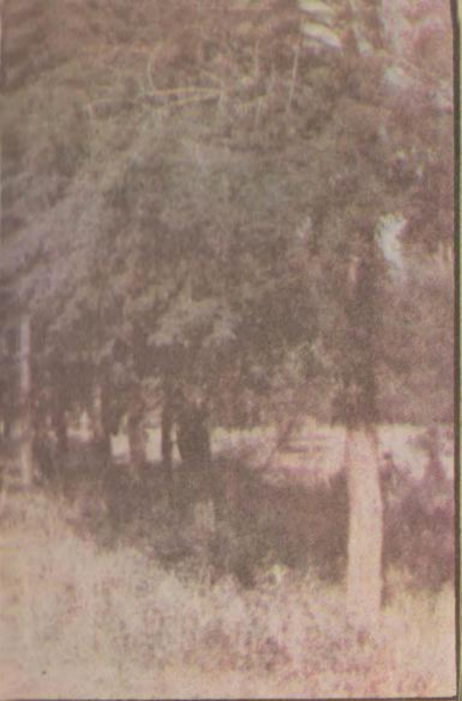

ক্যাম্পের কর্মসূচী শুরু হল বিকাল সাড়ে চারটায়। প্রথমে মিউজিয়াম দেখা। ছেলেমেয়েরা মনোযোগ দিয়ে ছোট্ট মিউজিয়ামের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখতে লাগল। মিউজিয়ামে রয়েছে পালামৌ অভয়ারণ্য থেকে সংগৃহীত ডাকাবুকো এক বাঘের কঙ্কাল; আঠারো ফুট লম্বা এক ময়াল সাপ, চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর ও চিতল হরিণের কঙ্কালও রয়েছে। চিতল হরিণদের এক ধরনের তারের ফাঁদ দিয়ে ধরা হত। সেই ফাঁদও মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে।

পালামৌ অভয়ারণ্যে প্রায় ১০০ রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যায়। মিউজিয়ামের শো-কেসে 'প্রজাপতির অপূর্ব সংগ্রহ' দেখে আমাদের সঙ্গীসাথীদের কয়েকটি রঙিন ফিল্মের ক্যামেরা তৎপর হয়ে উঠল। এখানে বাইসন ও সম্বরের শিং ছাড়া বাঘের পায়ের ছাপও সযত্নে সংরক্ষিত। আমাদের গাইড অধ্যাপক শ্রীবাস্তবজী জানালেন যে, বাঘিনীর পায়ের ছাপ ছোট, কিন্তু বাঘের পায়ের ছাপ হয় বিস্তৃত ও ছড়ানো। দুটি বাঘের পায়ের ছাপ কখনো এক হয় না।

ধাহারি মাকড়সা

গাছে উঠে চিতাবাঘের বিশ্রামের আয়োজন

গ্রীষ্মকালে হাতিরা শরীর শীতল করছে

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় চা-জলযোগের পর সবাই গেলাম ট্যুরিস্ট লজের পিছনে ঢালু মাঠে। এই সময়ে প্রতিদিন চিতল হরিণের দল মহুয়া ফল খেতে আসে। প্রায় এক ঘণ্টা হাপিত্যেশে কাটল। ফিরে যাব ভাবছি এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম মহুয়া গাছগুলির নীচে প্রায় কুড়িটা চিতল হরিণের একটা দঙ্গল। সঙ্গে শিংওয়ালা হরিণও ছিল। অতগুলো চিতল হরিণকে প্রাকৃতিক

রাতের অন্ধকারেও এই যন্ত্রে চোখ রাখলে বন্য জন্তুদের দেখা যায়

পরিবেশে দেখতে পেয়ে আমাদের ছোট সঙ্গীরা কী খুশি।

রাত্রি আটটার সময় ক্যাম্পের ছেলেমেয়েদের জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয় প্রথম। সবাইকে দুটি দলে ভাগ করে একটি পিক-আপ ভ্যান এবং একটি জীপে করে পাঠানো হয়। গ্রুপ দুটির সঙ্গে ছিল 'স্পটলাইট', এবং স্পটলাইট ফোকাস করে বনে জন্তু-জানোয়ার দেখানোর জন্য একজন করে দক্ষ 'স্পটার'। দল দুটি বনের মধ্যে এক ঘণ্টারও বেশি ঘুরে ঘুরে চিতল হরিণ, রেসাস বানর, লাঙুর, গৌর, বুনো শুয়োর, জংলি বিড়াল দেখতে পেল। তারপর ডেরায় ফিরে এক আলোচনাচক্র বসল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—জঙ্গল ও গাছপালা। দেখা গেল, আমাদের ছোট্ট সঙ্গীরা জঙ্গল বা গাছ-পালা সম্বন্ধে যথেষ্ট খবরাখবর রাখে।

পালামৌ অভয়ারণ্যের মোট আয়তন হল ৯২০ বর্গ কি মি। এর মধ্যে বেতলা অঞ্চল ২৭০ বর্গ কি মি। বেতলাতে আবার মাত্র ২৬ বর্গ কি মি নির্দিষ্ট আছে 'ট্যুরিস্ট-জোন' হিসাবে। পালামৌ অভয়ারণ্যকে চারটি রেঞ্জে ভাগ করা যায়—বেতলা, ছিপাদোহর, গারু ও বারেসার। অঞ্চল হিসেবে আবার দু-ভাগে বিভক্ত কোর ও বাফার। কোর অঞ্চলের আয়তন ২০০ বর্গ কি মি, পশুচারণ, গাছকাটা ইত্যাদি উপদ্রব নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ পর্যটকদের প্রবেশও। বাফার অঞ্চলে (আয়তন ৭২০ বর্গ-কি মি) পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি আছে।

পরদিন ভোরবেলা আবার জঙ্গলাভিযান। আমরা এক 'ওয়াচ টাওয়ারে' এসে হাজির হই। ওয়াচ টাওয়ার থেকে সামনে 'ওয়াটার হোল' (জন্তু-জানোয়ারদের জন্য জলাশয়)-এর কাছে জন্তু-জানোয়ারদের জল খেতে বা খেলা করতে দেখা যায়। ওয়াচ টওয়ার থেকে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। মহুয়া গাছে বসে বানরেরা মহুয়া ফল তুলছে আর গাছের

প্রকৃতি-পড়ুয়ারা গাছপালা চিনছে

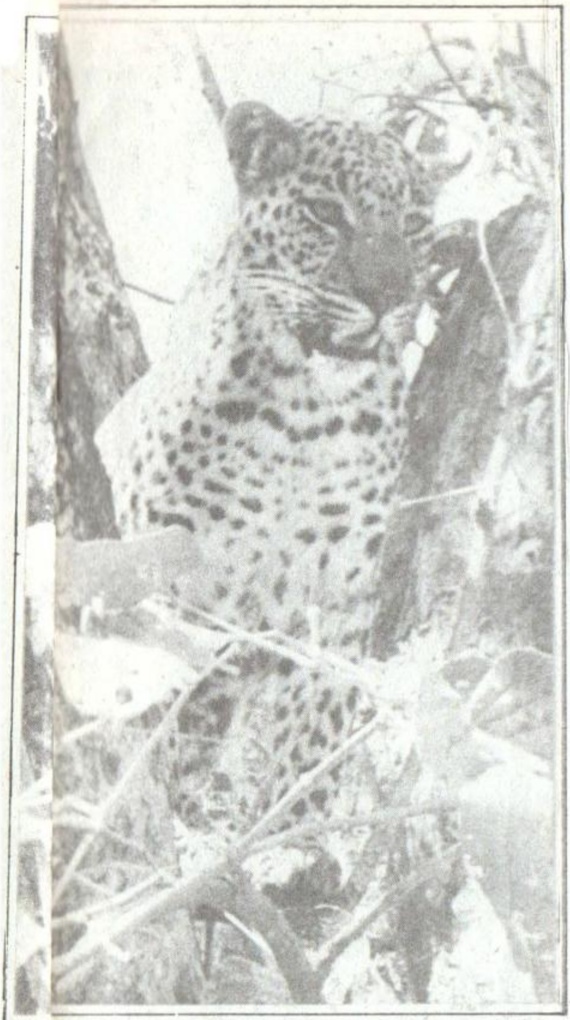

জ্বালাতন কোরো না, খেয়ে-দেয়ে একটু 'রেস্ট' নিচ্ছি

নীচে চিতল হরিণদের যোগান দিচ্ছে। কেমন পরোপকারী বানর! ওয়াচ টাওয়ারের সামনে ওয়াটার হোলে বনের জন্তু-জানোয়ারদের জন্য জল রাখা থাকে। এক একটি ওয়াটার হোল দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় ৭ মিটার। একটি খোলা ওয়াটার হোলের কাছে একটি ঢাকা ওয়াটার হোল দেখতে পাওয়া যায় জায়গায় জায়গায়। এই ধরনের ঢাকা ওয়াটার হোল জন্তু-জানোয়ারদের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য মজুত জলভাণ্ডার।

আমাদের ছোট্ট সঙ্গীরা ওয়াটার হোলের পাশে বসে বসে বহুক্ষণ ধরে নিবিষ্ট মনে জন্তু-জানোয়ারদের পায়ের ছাপ চিনতে লাগল।

বনে চিতল হরিণ, সম্বর, লাঙুর, বাইসন ছাড়াও নানা ধরনের পাখি দেখা গেল। যেমন—সারপেন্ট ঈগল, কমন ড্রোঙ্গো, কিং-ফিশার, ইণ্ডিয়ান রোলার, ট্রিপাই, গ্রে হর্ণবিল, রেড জঙ্গল ফোল, পীফোল, কপারস্মিথ, ম্যাগপাই রবিন। এই অভয়ারণ্যে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পাখি দেখার সৌভাগ্য হয় আমাদের। একটি হল 'র‍্যাকেট টেল ড্রোঙ্গো'। এটি এক ধরনের ফিঙে পাখি। এই পাখির বিশেষত্ব হল এদের লেজ। বেশ লম্বা, তারপর দু' ভাগে কাটা।

পরদিন সকালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ সম্বন্ধে এক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় ট্যুরিস্ট লজের পিছনে ঢালু জমিতে এসে একটা বৃহৎ যন্ত্রে চোখ লাগানো গেল। এই যন্ত্রে চোখ দিলে হলুদ-সবুজ লেন্সের সাহায্যে অন্ধকারেও সব কিছু দেখা যায়। আমরা চারধারে শুধু চিতলই দেখলাম। এই যন্ত্রটির নাম 'নাইট ভিউয়িং ডিভাইস' বা 'ইমেজ ইনটেনসিফায়ার'। এই যন্ত্রে ছবি তোলার জন্য 'ক্যামেরা অ্যাডাপটার'ও লাগানো আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীও এই যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। আফশোসের কথা, ঐ যন্ত্রেও আমরা হাতি দেখতে পেলাম না। কারণ হাতিরা নাকি গরমে পর্যাপ্ত জল খুঁজতে খুঁজতে বারেসার নামে এক জায়গায় ফিরে গেছে।

রাত্রে বন্য-প্রাণীদের নিয়ে দুটি তথ্যচিত্র দেখানো হল। প্রথমটি ('নাও ওর নেভার') উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অভয়ারণ্যে তোলা। দ্বিতীয়টির পটভূমি নেপালের চিতাবন ন্যাশনাল পার্ক।

জঙ্গলে ফোটো তোলা কী ঝকমারি ব্যাপার! একান্ত ধৈর্যের পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি একজন ক্যামেরাম্যান এবং গাইড হরিরামজীকে সঙ্গে নিয়ে 'ওয়াচ টাওয়ার' থেকে ফোটো তুলতে গিয়েছিলাম। হরিরামজী বারবার নিষেধ করে দিয়েছিলেন, 'কোনো রকম শব্দ করবেন না, জানোয়াররা শব্দ শুনলেই পালিয়ে যায়।'

ভোর ছ'টা থেকে শুধু পাঁয়তারাই সার হল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ওয়াচ টাওয়ারে কাটিয়েও কোন ছবি তুলতে পারলাম না।

বাঘের মধ্যাহ্নভোজ

দু'জনেই তাই আরো সাবধান হলাম। সামনের জানালাতে বড় বড় পাতা জড়ো করা হল যাতে জন্তু-জানোয়ারেরা বাইরে থেকে আমাদের দেখতে না পায়। শেষকালে সামনের ওয়াটার হোলের পাশে একত্রে ন'টা বানর, দশটা চিতল হরিণ, দু'টি বাহারি পেখমের ময়ূর ও দু'টি জায়াণ্ট সাইজের বেজি ক্যামেরায় ধর পড়ল। আমাদের ফোটো তোলা দেখে কিন্তু বড়সড় এক বানর দাঁত খিঁচিয়েছিল।

ক্যাম্প চলাকালে দুটি চিতার ভোজন-পর্ব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। আর এই সুযোগে ছোট ছোট সঙ্গীরা খাতা-কলম নিয়ে চিতার ব্যবহার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও লিখে নিল। এই দুই মা-হারা চিতাকে বেতলা বন বিভাগের কর্মীরাই খুঁজে পায়। তারপর থেকে বনের ভিতরে এক বড় খাঁচায় এদের আটকে রাখা হয়েছে।

ক্যাম্পের কথা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি 'নেচার ডিটেকশন গেম'-এর কথা না বলি। এই খেলায় অংশগ্রহণকারীরা যে জন্তু-জানোয়ার বা পাখির আওয়াজ শোনে তার নাম বলে। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপ

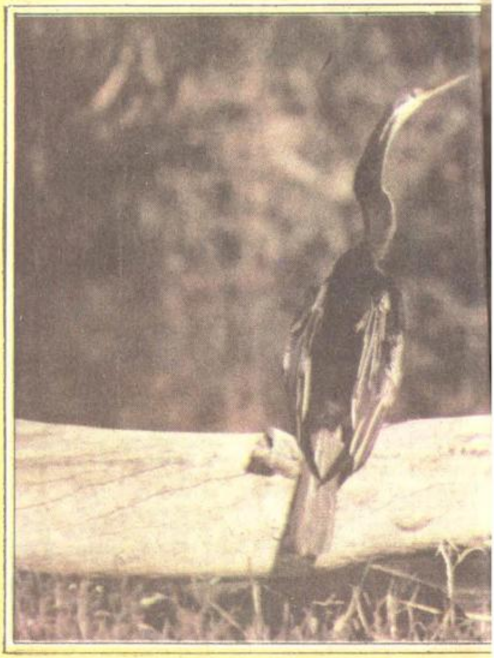

সাপের মতো গলার গড়ন, নাম তার 'স্নেকবার্ড'

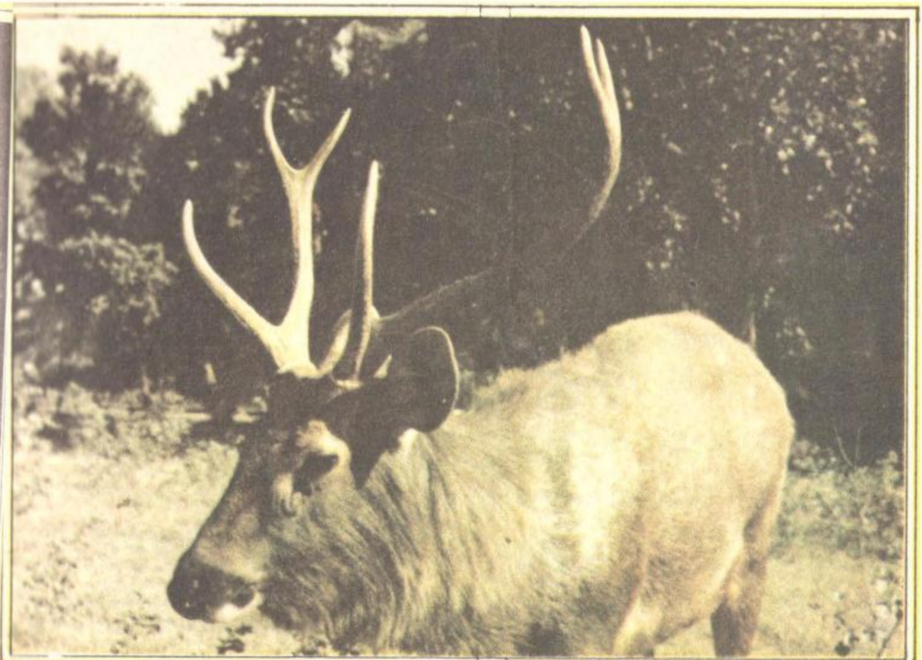

দ্যাখো রে, আমার শিঙের কী বাহার : অভয়ারণ্যের 'গৌর'

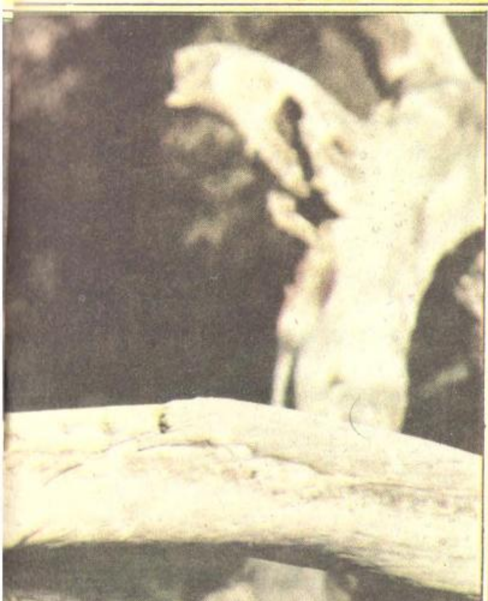

দেখেও তাদের নাম বলতে হয়।

ফিরে যাবার দিন ভোরবেলায় সবাই মিলে গেলাম পালামৌ ফোর্ট দেখতে—বেতলা ট্যুরিস্ট লজ থেকে প্রায় ছয় কি মি দূরে। এই ফোর্টটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজারা তৈরি করেছিলেন। জঙ্গলের পশ্চাদ্‌-পটে এই ফোর্টটিকে ছবির মতো দেখায়। ফোর্টের কাছেই একটি লেক।

কদিনের এই ক্যাম্প সবাইকার মন কেড়েছিল। ফেরার সময় ছোট্ট বন্ধুদের এক-জন বলল, 'আমাদের অচেনা অদ্ভুত এক জগৎ। খাওয়া-দাওয়া যেন ভুলে গিয়েছিলাম।' আর একজন বলল, 'এই ক্যাম্প আমার জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের ক্যাম্পে জন্তু-জানোয়ার দেখা ছাড়াও আমরা গাছ-পালা সম্বন্ধে কত কী জানতে পারি। জানতে পারি এই সব অভয়ারণ্য কত সমস্যার সম্মুখীন হয়।'

রঙিন ফোটো : এস পি শাহী
প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম রঙিন ফোটো : সুবীর রায়
অন্যান্য ফোটো : পবিত্র বসু

দুইজন সন্ধানী

সমরেশ মজুমদার

সারা রাত ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে হেঁটে ট্রেনটা যখন ওদের চক্রধরপুর স্টেশনে পেঁছে দিল তখনও আকাশ জুড়ে তারা সেঁটে আছে, আলো ফোটার তোড়জোড় শুরু হয়নি। এই ভোর না হওয়া রাতে স্টেশনে লোকজন কম, টিকিট কালেক্টর পর্যন্ত দরজায় দাঁড়ায়নি। এখন শীতের মাঝামাঝি, বিহারের এই অঞ্চলটায় তার দাপট খুব। যদিও দুজনের সর্বাঙ্গ ওভারকোট আর মাফলারে মোড়া তবু একটা কাঁপুনি আসছে থেকে থেকে। দুজনের একজন বেশ লম্বা, প্রায় সাড়ে ছ' ফুট, নাকটা খাঁড়ার মতো সামনে বাড়ানো। অন্যজন সাধারণ চেহারার, তবে মাথায় একটাও চুল নেই। দুজনেরই বাঁ হাতে ছোট ব্যাগ, অন্য হাত ওভারকোটের পকেটে রাখা রিভলভারের হাতলে। রিভলভারের স্পর্শ ওদের শরীরকে রুম-হিটারের মতো গরম করে রাখে।

ঢ্যাঙা লোকটি বলল, "একবার থানায় ইনফর্মেশনটা দিয়ে গেলে ভাল হত না?" এই শীতের রাতেও স্টেশনের সামনে একটা দোকান খোলা থাকতে পারে এবং সেখানে একটা মানুষ নিজের মনে জিলিপি ভাজতে পারে চট করে ভাবা যায় না। টাক মাথার নজর এখন সেদিকে, বেশ ম্যাক্সি সাইজের জিলিপি, কলকাতায় দেখা যায় না। পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করে সে এগিয়ে গেল দোকানদারের কাছে। দুটো জিলিপি শালপাতায় ধরে চাটতে চাটতে কাছে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "এই জন্যে তোমার প্রমোশন হল না চাকলাদার। প্রত্যেকবার তুমি রান্না করো আর সেটা খায় অন্য লোক। ইনফর্মেশন যখন আমাদের হাতে তখন কাজটা আমরাই হাসিল করব।"

ঢ্যাঙা লোকটা, যার নাম চাকলাদার, সে অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছিল জিলিপি চাটা দেখে। এই গাঙ্গুলিটার সঙ্গে ওর কিছুতেই পটে না। এই কেসটা একসঙ্গে করার জন্য ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই, তাই আসা। দু'বছর ইনক্রিমেণ্ট আটকে আছে, এফিসিয়েন্সি বার ক্রশ হয়নি বলে। প্রমোশন অনেকদিন ডিউ তবু হচ্ছে না। ঠিক একই কেস গাঙ্গুলির। যেমন করে হোক কাজটা হাসিল করতেই হবে। কিন্তু গাঙ্গুলিটা যা পেটুক, একবার অফার পর্যন্ত করল না! অবশ্য করলেও খেত না। হেভি ডায়েবেটিস আছে ওর। কিন্তু মুখ না ধুয়ে লোকে খায় কী করে? গম্ভীর গলায় সে বলল, "কিন্তু সে একা আছে কি না জানা নেই, ফোর্স নিয়ে গেলে হত না?"

চেটে চেটে জিলিপি খাওয়া যায় এই প্রথম দেখল চাকলাদার। খেয়ে দেয়ে দোকানদারের কাছ থেকে এক ভাঁড় জল চেয়ে বলল, "একাই আছে। দুজন দুটো রিভলভার নিয়ে খোলা মাঠে ওকে ধরব তার জন্য ফোর্স কী দরকার?"

জল খেয়ে পকেট থেকে দুটো নিমের দাঁতন বের করে একটা চাকলাদারকে দিয়ে গাঙ্গুলি বলল, "নাও, দাঁত মাজো, বাস আসার আগেই চা-ফা খেয়ে নাও। বুঝলে চাকু, এই কেসটায় কাউকে ভাগ বসাতে দেওয়া হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকামি।"

থার্মোমিটারের মতো নিমের দাঁতন মুখে পোরা গাঙ্গুলিকে পিট-পিট করে দেখল চাকলাদার। মাঝে মাঝে খুব আন্তরিক

ভঙ্গিতে গাঙ্গুলি তাকে চাকু বলে ডাকে। শুনলেই টং করে মাথার মধ্যিখানে একটা শব্দ হয়। কিন্তু প্রথমবার যখন প্রতিবাদ করা হয়নি তখন এখন আর বলার কোনো মানে হয় না। নিমের দাঁতন মুখে পুরতেই প্যাঁক-প্যাঁক করে একটা বাস এসে হাজির হল সামনে আর কষাটে রসে মুখ ভরে গেল। এতক্ষণ নজরে পড়েনি, আশেপাশের ছাউনি থেকে পিল পিল করে মদেশিয়া আর ওঁরাও সম্প্রদায়ের মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে এসে বাসটাকে ভরে ফেলল দু' মিনিটে। ড্রাইভার সমানে হর্ন বাজাচ্ছে আর সেই তালে গলা মিলিয়ে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, ''জলদি আও, জলদি আও!'' ভোর হল।

বাসটাকে সামান্য নড়তে দেখে গাঙ্গুলি ছুটে গেল সামনে, ''অ্যাই, টেবো জায়গা?'' কণ্ডাক্টরকে ঘাড় নাড়তে দেখেই গাঙ্গুলি চিৎকার করে চাকলাদারকে আসতে বলে ঠেলেঠুলে বাসে উঠে পড়ল। চাকলাদারের মুখ ভর্তি নিমের রস, সেটা ফেলে সে চলতে থাকা বাসটার হাতল ধরল। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাত ওভারকোটে, বলা যায় না যদি রিভলভারটা পকেটমার হয়ে যায়। বেজায় ভিড় বাসটায়। এই বাস ছেড়ে দিলে কী ক্ষতি হত? ঝুঁকে থাকা মাথাটা ঘোরাল চাকলাদার। বাসের ছাদটা বোধহয় ছ'ফুটের বেশি নয়। দেহাতি লোকগুলোর কি শীত লাগে না? বেশিরভাগের শরীরে গরম জামাকাপড় নেই।

একটা জায়গায় বাস থামতেই কণ্ডাক্টর চেঁচাল, "লাস্ট বাস, লাস্ট বাস। রাঁচিমে বাস ইস্টাইক হো গয়া।" ঘাবড়ে গিয়ে চাকলাদার অন্যদিকে মুখ ঘোরাতেই গাঙ্গুলিকে দেখে ফেলল। দুটো দেহাতি মানুষের উদ্বৃত্ত সীটে নিজেকে সেঁটে দিয়ে নির্বিকার মুখে দাঁতন করে যাচ্ছে। চোখাচোখি হতে নিমের রস ম্যানেজ করে গাঙ্গুলি বলল, "আমরা কি লাকি বল, বাসটা পেয়ে গেলাম।"

লাকি তো বটেই। বেশ আরাম করে সীটে বসে যাচ্ছে। ঘাড় গুঁজে দাঁড়াতে হচ্ছে না। লম্বা লোকের একটাই সুখ, ফ্রেস বাতাস নিশ্বাস নেওয়া যায়। বাকি সব ঝামেলা। কী বিশ্রী তেতো কষাটে হয়ে আছে মুখটা। এই প্রথম নিমের দাঁতন মুখে পুরেছিল সে। টুথব্রাশের চেয়ে দাঁতন নাকি ভাল কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে কতক্ষণে ভাল করে মুখ ধোবে। গাঙ্গুলির তো তাপ-উত্তাপ নেই। জিলিপি খেয়ে কেউ দাঁতন করে? চাকলাদার অনেকবার প্রতিজ্ঞা করা কথাগুলো মনে মনে আবার আওড়ে নিল, যেমন করে হোক কৃতকার্য হবেই এবং তার জন্য এই গাঙ্গুলিদের অভদ্র ব্যবহারে মন দেবে না।

অবিরত বিভিন্ন উপায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা পাহাড়ি পথে ছুটে চলছিল। হঠাৎ কণ্ডাক্টর চেঁচাল, "টেবো, টেবো হিলস।" তড়াক করে সোজা হতে গিয়ে চাকলাদারের মাথাটা ছাদে ঠুকে গেল জব্বর। গাঙ্গুলি ততক্ষণে সুড়ুত করে নেমে গিয়েছে নীচে। মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে চাকলাদার কোনরকমে বাস থেকে নামতেই বাসটা চলে গেল। গাঙ্গুলি বলল, "বেশ তো আড়াই ঘণ্টা বাসে চড়ে এলে, টিকিট কাটার কথা মনে ছিল?"

চাকলাদার বলল, "আমরা অন ডিউটি, কণ্ডাক্টরকে কার্ড দেখিয়েছি, তোমারটাও বলে

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে । তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি । এবার আমাকে একটা হামু দাও ।"

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৫৩

HTC-GDP-3760

দিয়েছি?" গাঙ্গুলির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার, "ইশ্‌! তোমার মাথায় কি একটুও হাওয়া খেলে না? বাসসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দিলে আমরা পুলিস। হয়ে গেল, যাকে ধরতে এসেছি সে যদি খবর পেয়ে যায়!" যেন অ্যাসিড খেয়েছে এমন ভঙ্গি করল গাঙ্গুলি। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে ঘাবড়ে গেল চাকলাদার, ভয় কাটাতে চারধারে তাকিয়ে বলল, "জায়গাটা খুব রোমান্টিক।"

খানিক গজগজ করে গাঙ্গুলি এবার কাজে মন দিল। ওরা একটা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে জঙ্গলে পাহাড় অন্য দিকে অনেকটা ঢালু জমি, কিছু বুনো গাছ নিয়ে পড়ে আছে। লোকজন চোখে পড়ছে না। অথচ টেবো হিলসে বেশ লোকজন থাকে এরকম ধারণা ওদের ছিল। চাকলাদার বলল, "এ কোথায় এলাম হে। জনমানবশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ মালভূমিতে—।" গাঙ্গুলি ওর কথায় কান না দিয়ে হেঁটে চলে জায়গাটা জরিপ করতে লাগল। রাস্তার বাঁকে দু'তিনটি চালাঘর দেখা যাচ্ছে। তার সামনে যারা বসে আছে তারা মানুষ তাতে সন্দেহ নেই। ফার্স্ট স্টেপ অব অ্যাকশন, ওদের জেরা করলে কিছু ক্লু পাওয়া যাবে। একটা বাঙালি ছেলে এখানে বাস থেকে নামলে যে-কোনো দেহাতি তাকে দেখবেই এবং নিজেরা তা নিয়ে গল্প করবে। অতএব ওদের জিজ্ঞাসা করা যাক। গাঙ্গুলিকে দ্রুত এগোতে দেখে চাকলাদার তার পিছু নিল, "বুঝলে গাঙ্গুলি, প্রথমে ভাল করে মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক। টোস্ট পেলে মন্দ হয় না। নিমের রসে মুখটা—।"

"ছ্যাবলামি কোরো না। তুমি একজন পুলিস অফিসার, অত খাই-খাই কেন?" কথাটা বলতে বলতে গাঙ্গুলি যে ঢেকুরটা তুলল তাতে ফ্রেস জিলিপির গন্ধ, অম্বল হয়ে গেছে।

লোকগুলো কোন খবর দিতে পারল না। চাকলাদার ভাবল, ব্যাটারা হিন্দিও ভাল করে বোঝে না, গরিব, না খেয়ে খেয়ে মৃতপ্রায়। বেশির ভাগের পায়ে গোদ। গাঙ্গুলি ভাবল, একটা ষড়যন্ত্র চলছে নিশ্চয়ই। একটা লোক এখানে এসেছে আর এরা দেখেনি? বলা যায় না এরা হয়তো তাকে সাহায্য করছে। অথচ জেরা করেও কোনো কথা আদায় করা যাচ্ছে না। এখানে এরা বসে আছে কারণ বাড়ির মেয়েরা পাঁচ মাইল দূরে একটা ঝোরা থেকে জল আনতে গিয়েছে। সেই জল এলে ওরা খাবে। এখানে নাকি জল পাওয়া যায় না।

চাকলাদার জিজ্ঞাসা করল, "হিঁয়া হোটেল হ্যায়?"

যে ওদের মোড়ল সে ঘাড় নাড়ল। যা বাবা! চাকলাদার আবার জিজ্ঞাসা করল, "চায়কে দোকান?" বলে হাতের মুদ্রায় বোঝাতে চাইল চা কী করে করে! না, এখানে চা-বিড়ি-সিগারেটের দোকান নেই। এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে টেবোতে ওসব পাওয়া যাবে। এতক্ষণে ওরা বুঝল টেবো আর টেবো হিলস আলাদা জায়গা। ওরা কি ভুল করে ফেলল? গাঙ্গুলি পকেট থেকে কাগজ বের করে দেখল সেখানে টেবো হিলসই লেখা রয়েছে। তবে? "দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমন হয়েছে যে কারোও ইনফর্মেশন কেউ দেবে না।" বেজার মুখে বলল সে।

তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে ওরা মুখ ধুতে পারবে না, চা খেতে পারবে না এবং যেজন্য আসা সেই ছেলেটির কোন খবর পাচ্ছে না। এসব চিন্তা করতেই চাকলাদারের মনে হল তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সেই কাল সন্ধেবেলায় কলকাতায় শেষ জল পেটে পড়েছিল। অথচ জল নাকি পাঁচ মাইল না গেলে পাওয়া যাবে না। সারা রাত ট্রেন জার্নি, তারপর এতদূরে বাসের ঝাঁকুনি খেয়ে আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। এখানে বসে থাকলে ওদের মেয়েরা যখন জল নিয়ে ফিরবে তখন একটু চেয়ে নেওয়া যেতে পারে, চাকলাদার নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে দেখল তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। গাঙ্গুলি ঘাবড়ে গেলেও প্রকাশ করতে পারছিল না। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো! অম্বল হওয়ায় ওর ক্ষুধা-বোধটা এখন কাজ করছে না এই যা সুবিধে। আট ক্রোশ রাস্তা ভেঙে টেবো গেলে সেই ছেলেটির পাত্তা পাওয়া যেতে পারে। ষোল মাইল মানে গড়িয়াহাটা থেকে শ্যামবাজার যাওয়া আসা। কিছুই নয়। সে বলল, "নাও, মার্চ করো।"

"মানে?" হাঁ হয়ে গেল চাকলাদার।

"টেবোতে চলো। আজ বাস স্ট্রাইক, হেঁটেই যেতে হবে।" গাঙ্গুলি রাস্তাটার দিকে তাকাল।

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান **লেবুর মত চনমনে তরতাজা**

লিনটাস-LR.28-203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

"ইম্পসিবল। জল না খেয়ে এক পাও হাঁটতে পারব না।" চাকলাদারের মুখ দিয়ে কথাটা বেরুতে খুশি হল গাঙ্গুলি. হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। সে মোড়লের দিকে ফিরে বলল, "ইঁহা রেস্ট হাউস মানে কোন বাংলো হ্যায় ?"

লোকটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। চাকলাদার শুকনো গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করল, "আরে ভাই, ইধার কোই কুঠি হ্যায় ?"

হলুদ দাঁত বের করে হাসল মোড়ল. তারপর একপাশে আঙুল বাড়িয়ে জানাল ওদিকে একটা বড় কুঠিতে একজন বড় মানুষ থাকেন। গাঙ্গুলির কপালে ভাঁজ পড়ল, ওই জঙ্গলের মধ্যে যদি কেউ বাড়ি তৈরি করে থাকে তার মতলবটা কী? এই হতচ্ছাড়া জায়গায় যেখানে জলও পাওয়া যায় না সেখানে লোকটা থাকবে কেন ? কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে যায়—গাঙ্গুলি উদ্দীপ্ত হল। এও তো হতে পারে যে-ছেলেটিকে ওরা চাইছে সে ওই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছে। চাকলাদারও ব্যাপারটা ভেবে ফেলেছে। ওরা আর কথা না বাড়িয়ে পিচের রাস্তা ছাড়িয়ে নীচে নামল।

দুপাশের জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ি চলার পথ। চাকলাদার একটু ঝুঁকে মাটি দেখে বলল, "কাল রাতে একটা জীপ ভেতরে ঢুকেছে।"

গাঙ্গুলি বলল, "জীপ না অ্যাম্বাসাডার।"

"নেভার। জীপই। ভারী চাকা আর এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা—জীপ ছাড়া চলবে না।" অনেকক্ষণ পরে চাকলাদার গাঙ্গুলিকে এক হাত নিয়ে বলল, "রিভলভার রেডি রাখো। যার কাছে যাচ্ছি সে খুব ডেঞ্জারাস। একা এরকম জায়গায় থাকে যখন তখন নিশ্চয়ই কীর্তন করে না।"

ওরা সতর্ক পা ফেলে হাঁটছিল। দুপাশে জঙ্গলে কোন পাখি পর্যন্ত নেই। কেমন নেড়া-নেড়া গাছগুলো। এই সকাল দশটাতেই বেশ ছমছম করছে চারধার।

গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করল. "কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবে ?"

চাকলাদার বলল. "জল খেতে চাইব। একবার বসতে দিলে শুতে কতক্ষণ!"

গাঙ্গুলির মনেহল কোথাও যেন কেউ কথা বলছে। সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে বিফল হয়ে বলল, "মারাত্মক জায়গা। জানি না আমাদের ওপরে কেউ ওয়াচ রাখছে কিনা!"

চাকলাদার বলল. "এরকম জায়গায় বাড়ি থাকবে মনে হচ্ছে ? লোকগুলো মানে বুঝতে পেরেছে তো ?"

গাঙ্গুলি জবাব দিল না। ওর একটা হাত রিভলভারের বাঁটে, যে-কোনো মুহূর্তে ফায়ার করার জন্য সে প্রস্তুত। হঠাৎ একটা প্রচন্ড চিৎকার প্রায় মাথার ওপর এমন আছড়ে পড়ল, প্রথমে ওর শরীর হিম হয়ে গেলেও সামলে নিয়ে রিভলভার বের করে দেখল একটা বিরাট বাজ পাখি ওর দিকে তাকিয়ে চোখ ঘোরাচ্ছে। চাকলাদার চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল চিৎকার শুনে, এবার চোখ খুলে পাখিটাকে দেখে বলল, "এরকম একটা পাখি গানস অব নভরোন-এ ছিল।" গলায় এখনও কাঁপুনি আছে, "লোকটার এজেন্ট নয় তো ? অরণ্যদেবে পড়েছি।" এবার পাখিটার ওপর রেগে গেল গাঙ্গুলি। গুলি করবে কিনা ভাবতেই সেটা উড়ে চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর জঙ্গলটা হালকা হয়ে গেল। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে একটা রাজপ্রাসাদ চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ওরা। বেশ উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখল একটা বাগান-ঘেরা দোতলা বাড়ি চুপচাপ দরজা জানালা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাকলাদার ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল. "খুব বড়লোক মনে হচ্ছে।"

"ক্রিমিন্যাল!" চাপা গলায় জানাল গাঙ্গুলি, "নইলে এই পান্ডববর্জিত জঙ্গলে কী ধান্দায় এই বাড়ি তৈরি করবে? নিশ্চয়ই গোপন কারবার আছে।"

চাকলাদার উৎফুল্ল হল এবার, "উঃ, এক ঢিলে দুই পাখি। পলাতক আসামী আর বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল গ্রেফতার। ডাবল প্রমোশন কে আটকায়!"

শুধরে দিল গাঙ্গুলি, "ক্রিমিন্যালরা বিখ্যাত হয় না, কুখ্যাত। বাংলাটাও জানো না? থাক, এখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। রিভলভার থেকে হাত সরাবে না।" (ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

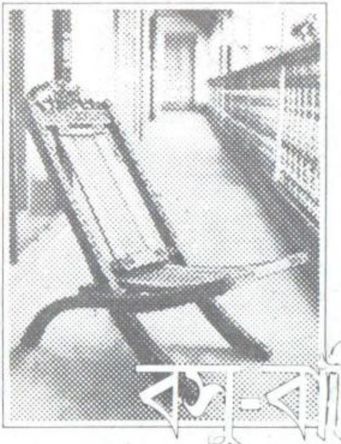

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ১৩ ॥

ষাট দশকের মাঝামাঝি হবে। সন্ধ্যায় আমি উডবার্ন পার্কের বাড়ির একতলায় আমার চেম্বারে বসে আছি। এক ভদ্রলোক তাঁর কার্ড পাঠালেন, বড় একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় অফিসার।

ভিতরে এসে বললেন, তিনি রুগি দেখাতে আসেননি। প্রায় রোজই তিনি অফিস থেকে বাড়ি যান আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এবং রোজই বাড়িটাকে বাইরে থেকে নমস্কার করে যান। সেদিন কী মনে করে ঢুকে পড়েছেন।

তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তিনি তখন বললেন, "দেখুন, আমি যে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি সে-সবই আপনার বাবার জন্য। আমি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলাম, আপনার বাবার সাহায্যেই আমি লেখাপড়া করি। সে-জন্য ১ নং উডবার্ন পার্কের এই বাড়ি আমার কাছে এক পবিত্র স্থান। কিছু মনে করবেন না, বিরক্ত করে গেলাম।"

দাদাভাই জানকীনাথ খুব কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া শিখেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি যে, তিনি বাবাকে বলেছিলেন, যখন সামর্থ্য হবে তখন বাবা যেন গরিব কিন্তু যোগ্য কিছু ছাত্রকে লেখাপড়া করতে সাহায্য করেন। দাদাভাইয়ের কথামতো বাবা নিজে আইন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠালাভের পরে একদল দুঃস্থ কিন্তু মেধাবী ছাত্রকে নিয়মিত পড়াশোনার খরচ দিতেন। আমরা কৌতূহলী হয়ে ভাবতুম, মাসের প্রথমে নীচের তলায় ছেলে-ছোকরাদের এত ভিড় হয় কেন? খুড়োদাদাবাবুকে (শৈলেন্দ্রনাথ বসু) এ ব্যাপারে সব খাতাপত্র রাখতে হত। তিনি প্রায়ই হিসাবপত্র গোলমাল করে ফেলতেন।

বাবা চেপে ধরলে বলতেন, "বেশি কিছু না. আমি তো কেবল এক মাস পিছিয়ে আছি।" যখনই পারতেন বাবা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত বাবাকে দেখাতে হত।

বাবা জেলে যাবার পর ঐ সব ছাত্ররা খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। অনেকেরই হয়তো লেখাপড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদেরই মধ্যে দুজন ভদ্রলোক যাঁরা তাঁদের ছাত্রাবস্থায় বাবার সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিলেন, আমাদের দুঃসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনকেই আমরা দাদা বলতাম এবং এখনও বলি। মায়ের আর্থিক অনটনের কথা ভেবে তাঁরা ছেলেমেয়েদের কাপড়জামা ইত্যাদি উপহার দেবার অছিলায় আমাদের সাহায্য করতেন। অসুখে-বিসুখে আমাদের কাছে-কাছে থাকতেন। আমাদের প্রফুল্ল রাখবার জন্য নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতেন।

রাঙা-কাকাবাবু তো সবসময়ই রাজনৈতিক কাজ নিয়ে মেতে আছেন, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে তাঁর তো দিনরাত মেলামেশা। গুপ্ত বিপ্লবী দলের ছেলে-মেয়েদের প্রেরণাও অনেকক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র। বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিশেষ করে বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক ছিল একটু ভিন্ন রকমের, কিন্তু খুবই গভীর। সেটা সাধারণ লোকের চোখে পড়ত না। দেশের কাজে সহকর্মীরা জেলে গেলে তাঁদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা, বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ইত্যাদি করতেন। এই কাজেও দুই ভাই ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। বাবা ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর পক্ষ সমর্থন করে পরিবারের এক শুভার্থী এক বড় ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে যান। ইংরেজ অফিসারটি বললেন, "দেখ, শরৎ

বসু তো অনেক টাকা উপার্জন করেন। ইনকাম-ট্যাক্সও তো অনেক দেন। তবে আমরা দেখছি যে, এখন ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা নেই বললেই চলে। আমরা জানি, শরৎ বসুর কোনও বাজে বিলাসিতা শখ বা অভ্যাস নেই, তবে টাকাগুলো যায় কোথায়? নিশ্চয়ই তিনি গোপনে কংগ্রেসের কাজে ও বিপ্লবীদের টাকা দেন।"

এই যে বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের কথা বললাম, তাঁরাও অজান্তে আমাদের বেশ প্রভাবিত করতেন। খবরের কাগজে তাঁদের সম্বন্ধে দু'রকম খবর বেরোত। এক, অত্যাচারী ইংরেজ অফিসারদের ওপর আক্রমণের কাহিনী বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের মতো দুঃসাহসিক অভিযান। দুই, এইসব বিপ্লবীদের বিচারের বিবরণ অথবা তাদের নির্বাসন বা ফাঁসির খবর। এইসব খবর আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় করত। বাংলার তরুণ বীরদের আত্মত্যাগে আমরা যেমন অভিভূত হতাম, তেমনি গর্বিতও হতাম। বাবা ও বাড়ির অন্যরা এই ধরনের খবরে যে বেশ বিচলিত বোধ করতেন, সেটা আমাদের মতো ছোটরাও বুঝতে পারত। বাবা ও রাঙা-কাকাবাবুর সঙ্গে এই সব ছেলেমেয়েদের যেন একটা নাড়ির টান ছিল। কোনও ফাঁসির খবর এলে সারা বাড়িতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করত। আরও একটু বড় হবার পরে বাবার মুখে একটা কথা বেশ কয়েকবার শুনেছি।

বাবা রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে বলতেন, "দেখ, এই সব ছেলেমেয়ের অনেককেই আমি কাছ থেকে দেখেছি ও জেনেছি। এরা সব 'স্টার্লিং গোল্ড', খাঁটি সোনা।"

অনেক পরে বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে শুনেছি, বাবা বিনয় বসুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে লুকিয়ে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন এবং তার জন্য যত টাকা লাগে নিজেই দিতে রাজি ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের বিপ্লবীদের যখন বিচার শুরু হল, আদালতে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য বাবা চট্টগ্রামে যাওয়া আসা করতে লাগলেন। সেই সময় অনন্ত সিংহের বোন ইন্দুমতী আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ইন্দুমতীর সঙ্গে আমরা ছোটরাও

শরৎচন্দ্র বসু (১৯৩১)

বেশ ভাব জমিয়েছিলাম।

রাঙা-কাকাবাবুর জীবন ছিল একমুখী—দেশ আর দেশ। বাবা ও রাঙা-কাকাবাবুর জীবনযাত্রায় খানিকটা তফাত থাকা স্বাভাবিক। বাবার আইন ব্যবসা আছে, আছে দেশের কাজ, আরও আছে নিজের সংসারের দায়িত্ব। নেহাত কাজের কথা ছাড়া কথাবার্তা বলার অবকাশ কম। বসে গল্পগুজব বা তুচ্ছ সামাজিকতা করার কথাই ওঠে না। এই কারণে অনেকেই বাবার নাগাল পেত না। ভাবত, তিনি বোধহয় পাত্তাই দিচ্ছেন না। ফলে, কখনও-কখনও ভুল বোঝাবুঝি হত।

বাড়িতে তো অসুখ-বিসুখ করেই। এ ব্যাপারে আমি ছিলাম ফার্স্ট। আমার এত অসুখ করত যে কী বলব! কত রকমের অসুখ। বাবা বাড়িতে অসুখবিসুখের সময় একেবারে শান্ত ও অবিচলিত থাকতেন। আমাদের নতুন কাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসুর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁর হাতে ছেলেমেয়েদের বা মায়ের চিকিৎসার ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন।

যখন বিশেষ কারণে অন্য ডাক্তার ডাকতে হত, নতুন-কাকাবাবুর মতামতই বাবা গ্রহণ করতেন। ছোটবেলায় বুঝিনি, পরে বুঝেছি বিপদের সময় শান্ত ও অবিচলিত থাকার মূলে ছিল বাবার গভীর ভগবৎ বিশ্বাস।

বাবার দুটি দীর্ঘ-মেয়াদী কারাবাসের সময় বাড়িতে ছেলেমেয়েদের, মায়ের, দাদা-ভাই, মা-জননীর ও অন্য অনেকের গুরুতর অসুখ-বিসুখ, অপারেশন ইত্যাদি হয়েছিল। প্রথমবার কারাবাসের সময় তিনি হারিয়েছিলেন দাদাভাইকে, দ্বিতীয়বার মা-জননীকে। সব বিপর্যয়ই বাবা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন নিয়তির অমোঘ সত্য হিসাবে।

এই সূত্রে নতুন-কাকাবাবুর কথা কিছু বলি। সুনীলচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি, এবং কথাবার্তায় খুব সপ্রতিভ। তিনি বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফেরার পরে কিছুদিন হ্যারিংটন স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাট - বাড়িতে ডাক্তারি শুরু করেন। দরকার পড়লেই মা তাঁকে খবর দিতেন। এমন হাঁকডাক করতে করতে তিনি আসতেন যে, বাড়িতে বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা দিত। চিকিৎসা তো করতেনই। সঙ্গে-সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়ে দিতেন, নানা রকম রসালো গল্প। তিনি পুরোপুরি সাহেব ছিলেন পোশাক-আশাকে, আদব-কায়দায় এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। মাঝেমাঝে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে আমাদের নিয়ে যেতেন। বিলিতি কেক, বিস্কুট, চকোলেট উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ঢুকত না। নতুন-কাকাবাবুর কল্যাণে আমার তার কিছু স্বাদ পেতাম।

তাঁর রাজনৈতিক মতামত অন্য ধরনের ছিল। তিনি বেশ খানিকটা ইংরেজ-ঘেঁষা ছিলেন বলা চলে। কিন্তু তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনও তারতম্য ঘটত না।

তোমরা হয়তো ভাবছ, যে পরিবারে সুভাষচন্দ্র জন্মেছিলেন, সেই পরিবারে অন্য মতের লোক কী ভাবে আসে! কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক। কেবল রাজনৈতিক মতামতের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কের তিক্ততা আসাটাই অস্বাভাবিক। ডাক পড়লেই নতুন-কাকাবাবু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাবা ও রাঙা-

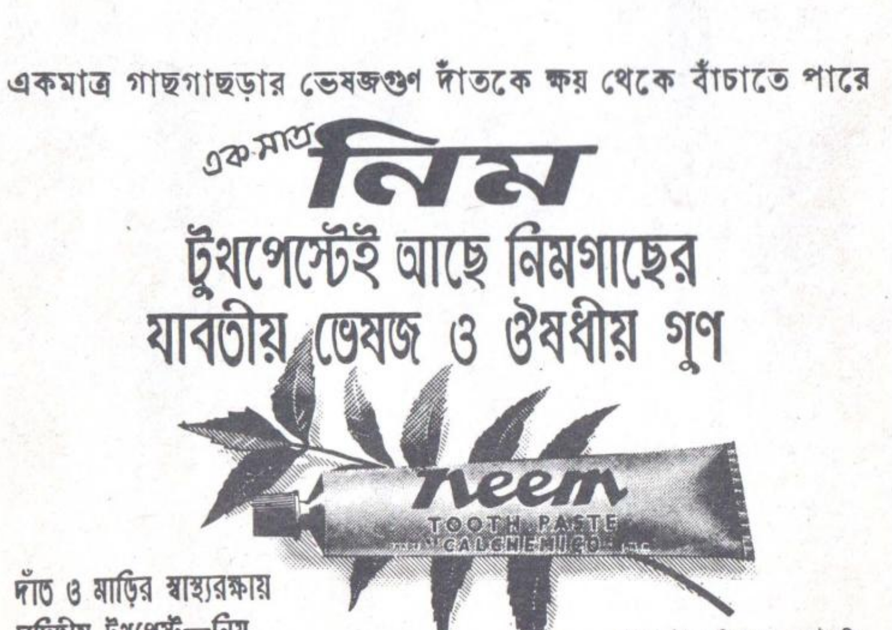

কাকাবাবুর রাজনৈতিক এমনকী বিপ্লবী বন্ধুদেরও মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতেন।

নতুন-কাকাবাবুর কথা বলতে গিয়ে আর একজনকার কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময় —তিরিশ দশকের প্রথমে নতুন-কাকাবাবুর সঙ্গে তাঁদের ছোটমামা, আমাদের ছোটদাদা-বাবু, রণেন্দ্রনাথ দত্ত থাকতেন। ছোটদাদা-বাবুর চেহারা ছিল সাহেবের মতো। আচার-ব্যবহারেও তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব। দেশী কায়দায় খাবার দিলে তিনি আমাদের দেশী শাক-সব্জি সম্বন্ধে মজার মজার মন্তব্য করতেন। যেমন "আবার তোদের সেই লক্ষ্মীছাড়া বেগুন, আর হতচ্ছাড়া পটল!"

কয়েকটি ব্যতিক্রম থাকলেও বাবাদের জেনারেশনে মামা-ভাগ্নের মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ সাদৃশ্য ছিল। সেটা হল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। তাঁরা সকলেই ভোজন-রসিক ছিলেন। বাবা ও রাঙা-কাকাবাবুও এই দলে পড়তেন। পরিমাণেও তাঁরা বেশি খেতেন।

আমাদের জেনারেশনের ছেলে-মেয়েরা তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না বলে তাঁরা আমাদের খানিকটা কৃপার চোখে দেখতেন। ছোটদাদাবাবু রণেন্দ্রনাথ ও লালদাদাবাবু সত্যেন্দ্রনাথের ডিমের ওম-লেটের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। শুনেছি ছোটদাদাবাবু রাতের খাওয়া শেষ করে মুখ ধুয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে অন্যদের বলতেন, ওমলেটের টুকরো তাঁর মুখে ফেলে দিতে, যাতে তিনি ওমলেটের স্বাদ—যেটা তাঁর কাছে ছিল অমৃতসমান—মুখে নিয়ে ঘুমোতে পারেন। লালদাদাবাবু সারা জীবন আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাঁকে বড় মাপের একটা ওমলেট দেওয়া হত।

পিসিমাদের কাছে শোনা আর একটা পুরনো গল্প বলি। এলগিন রোডের বাড়িতে তো অনেক লোক। লালদাদাবাবু, তখন তাঁর বয়স অবশ্য কম, বাজি রাখলেন যে, বাড়িতে সকলের জন্য যতটা ভাত রান্না হয় সবটা তিনি একলাই খাবেন। প্রায় বাজিমাত করে এনেছিলেন। শেষ গ্রাস নেওয়ার সময় আর পারলেন না, সবটাই উঠে গেল। (ক্রমশ)

ভূতের মুণ্ডু

সুরজিৎ ঘোষ

ভূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল
শনিবার রাত আটটায়
ভয়-টয় কিছু দেখায়নি, শুধু
বলেছিল, 'এই মাঠটায়
এত বেশি কাদা, ওরে দাদা আমি
পারছি না আর চলতে,
তা ছাড়া বোঝাটা বড্ডই ভারী—'
এ কথা বলতে বলতেই
ঘাড় থেকে তার মুণ্ডুটা খুলে
আমাকে দিয়েছে ধরিয়ে
তারপর সোজা হেঁটে চলে গেছে
দু'হাতে বাতাস সরিয়ে।

কিছুই হয়নি, কোত্থেকে এসে
মেজমামা এক গাঁট্টায়
ভূতের মাথাটা কেড়ে নিয়ে গেল
এ কী বিদঘুটে ঠাট্টা!

ছবি সুনীল শীল

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য ঃ তরুণ মজুমদার
ছবি ঃ বিমল দাশ

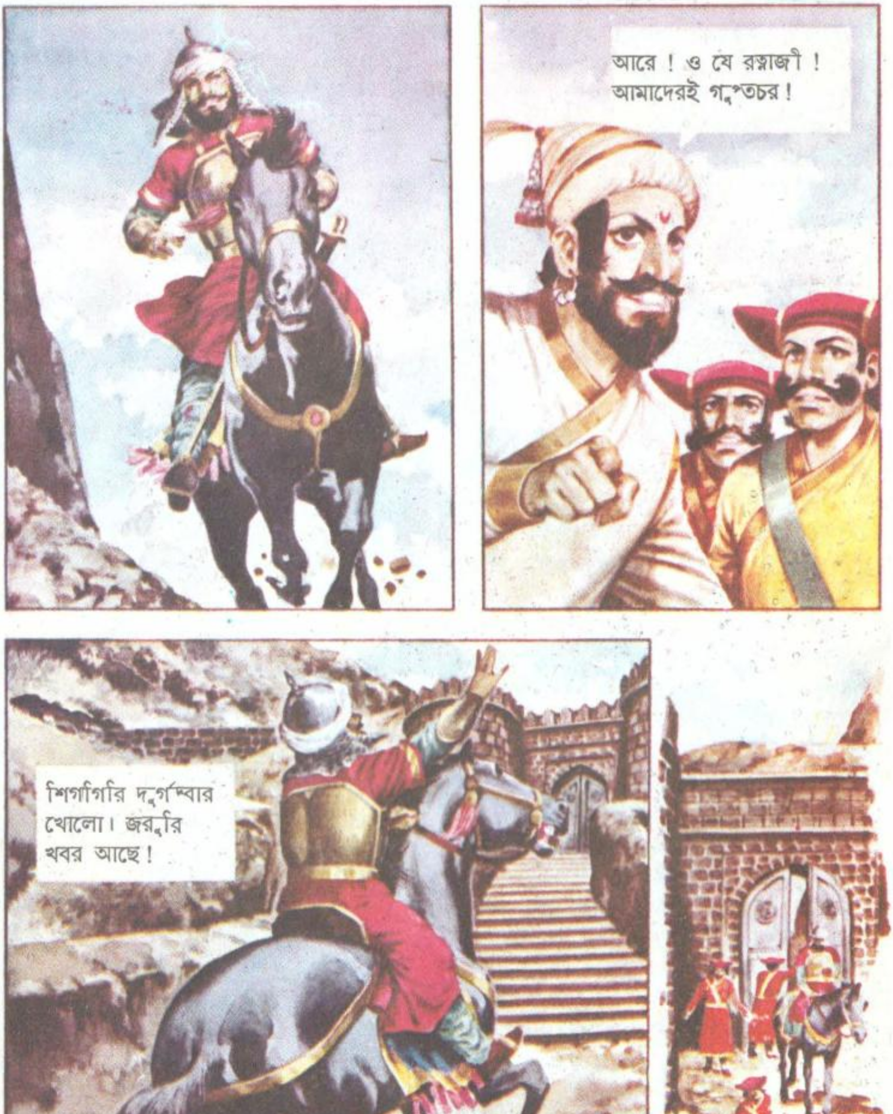

একটু পরে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে…
খবর খারাপ! বিজাপুরী সেনাপতি লিয়াকত খাঁ সাত হাজার ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসছে—এই তোর্না দুর্গ ঘেরাও করতে!
বল কী রত্নাজী?
তুমি ঠিক জানো?
তবে আর বলছি কী? তোমার নির্দেশে গুপ্তচরের কাজে বিজাপুরী সৈন্য সেজে ঢুকে পড়েছিলাম খোদ লিয়াকত খাঁ-র বাহিনীতে। আজ সকালে শুনি…
বিজাপুরী সেনাপতি লিয়াকত খাঁ-র শিবির
কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায়। কাল দুপুরের মধ্যেই তোর্না দুর্গ অবরোধ করে তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেব। দেখি কোথায় পালায় শিবাজী!
জো হুকুম সেনাপতি!

রোভার্সের রয়
ব্রেয়ন র‍্যাপিডের সঙ্গে ফিরতি খেলায় রয় মাঠে নামেনি····
রয় খেলছে না। এই সুযোগে আগের গোল তিনটি শোধ করে····
আমরা সমান-সমান হয়ে যেতে পারি।
ব্রেয়ন গোলে শট নিয়েছিল!
গোলকি বাঁচিয়েছে!
চার্লির সত্যি তুলনা হয় না।
জিমি স্লেডকে বল দিল!
জিমি, নাও!
জিমি দিল ব্ল্যাকিকে····কিন্তু····
উঃ, একটুর জন্যে!
মনে হচ্ছে, ব্রেয়ন এ-খেলাতেও হারবে!
দেখছ তো, আমাকে ছাড়াই ওরা দিব্যি চালিয়ে নিচ্ছে।
দেখা যাক!
হঠাৎ····
আরে, লুই কীভাবে এগোচ্ছে দ্যাখো! লোকটা ভীষণ ধূর্ত!
এগোতে-এগোতে লুই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল!
মেরেছে!
এ কী?
ফাউল! পেনাল্টি!

লফ্‌ট হতভম্ব !
পেনাল্টি ? সে কী, আমি তো ওকে ছুঁইনি পর্যন্ত !
তাজ্জব কাণ্ড !
লুই-ই কিক করল…
গোল !
যে-করেই হোক, বাকি গোলটা শোধ করতে হবে !
হাফ-টাইমে…
আমি জানি, ওটা লুইয়ের জোচ্চুরি ! যাক গে, তোমরা দারুণ খেলছ !
কিন্তু দুটো গোল শোধ করে ওরা খেপে গেছে !
আমি বলি কী, তুমি নামো !
না না, আমাকে ছাড়াই দিব্যি খেলছ তোমরা !
কুড়ি মিনিট খেলা চলবার পরে…
লুই আবার এগোচ্ছে…
ROVERS
লোকটা ভীষণ ধূর্ত ! হুঁশিয়ার !
পাছে পেনাল্টি দেয়, এই ভয়ে গাইলস্ ঠিকভাবে ট্যাকল করল না…
উঃ !
নাও পিয়ের, গোলে মারো !
গো-ও-ও-ল্ !
তিনটে গোলই শোধ হয়ে গেল !
ব্রেয়ন র‍্যাপিড ৩ মেলচেস্টার রোভার্স ৩
গাইল্‌স জখম হয়েছে…
রয়কে এবারে নামতেই হবে !
না-নামলে আমরা হারব !
রয়, নামো !
না না, আজ আমার খেলার মেজাজ নেই !
রয় কি ঠিককথা বলছে ?
এর পর আগামী সংখ্যায়

টিনটিন! টিনটিন! কোথায় তুমি?
ভৌ ভৌ!
জলপ্রপাতের পিছনে!
সে আবার কী করে হয়?
এদিকে এলেই দেখতে পাবে।
?
আস্তে-আস্ত নেমে এসো…
এবারে নজর করো, জলপ্রপাতের মধ্য দিয়ে আমি একটা পাথর ছুঁড়ছি।
দেখেছ?
!
!
নাও, এবারে একটি দড়ির মাথায় পাথর বেঁধে জলের মধ্য দিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দাও!
দিচ্ছি!
তৈরি থাকো! এক্ষুনি ছুঁড়ব!
চমৎকার!
এ-মুড়ো আমি বাঁধছি, ও-মুড়ো তোমরা বাঁধো!
বেশ!
বেঁধেছি!
এইবারে দড়ি ধরে এদিকে চলে এসো।
?
আমরা যাব কেন? তুমি এসো।
না না, তোমরাই এসো। ভয় নেই, জলের দেওয়াল খুব পুরু নয়।
ঠিক বলছ তো?
হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।
জয় মা!
দেখলে?
!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

কে?

বিমল মিত্র

॥ ৩২ ॥

বুড়িটা তখনও কাঁদছিল। সমস্ত মনের কথা বলে দিয়েও যেন সব কথা তার বলা হয়নি। জয়রামবাবু সূর্যনারায়ণের দিকে চাইলেন। বললেন, "শেষকালে তুমি কিনা আমার ছেলেকে চুরি করেছিলে সূর্য? তুমি আমার নিজের এত বড় বন্ধু হয়ে এই কাজ করেছিলে?"

সূর্যনারায়ণ বললেন, "তুমি আবার ভুল করছ! আমি কি ডাক্তারকে বলেছিলুম যে, বেছে-বেছে জয়রাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলেকেই দাও আমাকে। আমি তো এমন ছেলে চেয়েছিলুম যার কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ যার নেই। আমি কী করে জানব যে তোমার যমজ ছেলে হবে আর আমাকেই তাদের মধ্যে একটাকে দেওয়া হবে?"

জয়রাম জিজ্ঞেস করলে, "তা তুমি সেই ছেলেকে নিয়ে কী করলে?"

সূর্যনারায়ণ বললে, "আমার কপালেও সে-ছেলে বেশিদিন সইল না ভাই। অত ছোট একদিনের ছেলে নিয়ে বাঁচানো বড় শক্ত। আমি একজন নার্স ঠিক করলাম। সে বললে যে, সে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সেই নার্স অন্য একটা হাসপাতালে কাজ করত। সেই হাসপাতালেই সে তাকে রেখে দিলে।"

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সূর্যনারায়ণবাবু সেই বিচিত্র ঘটনাই সকলকে বলতে লাগলেন। কতকাল আগেকার কথা! কিন্তু এখনও সে-ঘটনা সূর্যনারায়ণবাবুর মনে আছে। তখন অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর। তাঁর শুধু একটি সন্তানই হয়েছিল, তা সেও আবার কন্যা-সন্তান। সেই কন্যা-সন্তানের একটা বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই কন্যা মারা যাওয়ার পর তিনি চাইছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র-সন্তান হোক। কিন্তু যখন সে-আশা তাঁর মিটল না, তখন তিনি পরের একটি ছেলে কেনবার জন্যেই এই চারুবালা দাসী আর ডাক্তার দয়াসুন্দর বসুর কাছে এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে, তিনি তাঁর বন্ধু জয়রাম চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছেলেকেই কিনলেন।

তিনি তখন চান্দোলিতে থাকেন আর মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসেন নার্সিং হোমে ছেলেটিকে দেখতে। একদিন বয়েসের ছেলে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা সহজও নয়। কিন্তু টাকা খরচের দিক দিয়ে তিনি কিছু কার্পণ্য করেননি। নার্সিং-হোমের ডাক্তার-নার্স সবাই জানল যে, সূর্যনারায়ণবাবুর স্ত্রী [illegible] বা গেছেন, তাই তিনি সন্তানকে নার্সিং-হোমে রেখে তাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন।

মাস কয়েক নার্সিং হোমে থাকবার পর একদিন তিনি চান্দোলিতে একটা টেলিগ্রাম পেলেন। 'শিগগির চলে আসুন, আপনার সন্তানের ভীষণ বিপদ।'

টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি চান্দোলি থেকে কলকাতায় চলে এলেন। এসে শুনলেন যে, তাঁর ছেলেকে বাঁচানো যায়নি। সে-ছেলে মারা গেছে।

সূর্যনারায়ণবাবু বলতে লাগলেন, "আমি আর কী করব। আসলে ছেলেটি তো আমার নিজের নয়, তাই তা নিয়ে আর বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করলুম না। নইলে যদি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে যায়। যদি সবাই জানতে পারে যে, ওটা আমার চুরি-করা ছেলে ছিল। তাই সমস্ত ঘটনাটাই আমি হজম করে গেলুম। মাঝখান থেকে মিছিমিছি আমার কয়েক হাজার টাকা গচ্চা গেল।"

"তারপর?"

"তার অনেক দিন পরে আমাকে নার্সিং-হোমের জমাদার জানিয়েছিল যে সে-ছেলে নাকি মারা যায়নি, তাকে কে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তো শুনে অবাক। কলকাতা শহরে এমন ঘটনাও ঘটে তাহলে। আমি একবার ভেবেছিলাম পুলিসে খবর দেব, কিন্তু শেষে ভয় হল তা করলে যদি সব জানাজানি হয়ে যায়।"

সবাই সূর্যনারায়ণবাবুর গল্প শুনছিলেন।

এতক্ষণ পরে চন্দ্রভানুবাবু বললেন,

''তাহলে এই দেবুই কি সেই আপনার হারিয়ে যাওয়া ছেলে?''

সূর্যনারায়ণবাবু বললেন, ''তা হতে পারে। আমি এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আমি পাপ করেছি জয়রামের ছেলেকে না জেনে চুরি করে। তার জন্যে যা শাস্তি আমার পাওয়ার তা আমি মাথা পেতে নেব। আপনারা ঠিক করুন কী শাস্তি আমাকে দেবেন।''

জয়রামবাবু বললেন, ''শাস্তি তুমিও পেয়েছ, আমিও পেয়েছি। চন্দ্রভানুও পেয়েছে। এখন যখন দু'জনকে আবার ফিরে পাওয়া গেছে তখন সব মিটমাট করে নেওয়াই ভাল। কিন্তু এখন কে ঠিক করবে কে আসল জ্যোতি আর কে আসল দেবু।''

চন্দ্রভানুবাবু বললেন, ''আমি যাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম সে-ই হচ্ছে আসল জ্যোতি।''

জয়রামবাবু বললেন, ''তুমি কাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে দেখিয়ে দাও—''

চন্দ্রভানুবাবু জ্যোতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

বললেন, ''এই একে নিয়েই আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম।''

জয়রামবাবু সূর্যনারায়ণবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি এবার বলো কে আসল জ্যোতি আর কে আসল দেবু।''

সূর্যনারায়ণবাবু জ্যোতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

বললেন, "এই, এই-ই হল আমার আসল দেবু। কিন্তু বারো বছর আগে আমি কাকে নার্সিং হোম থেকে নিয়ে এসেছিলুম, তা বলতে পারব না। কারণ এখন এত বছর পরে তা বলা সম্ভব নয়।''

চারুবালা দাসীর গলা দিয়ে এই সময়ে একটা করুণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সে জিজ্ঞেস করলে, ''আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন তো, জয়রামবাবু? শেষবারের মতো শুনে যাই আপনি ক্ষমা করেছেন কি না।''

জয়রামবাবু বললেন, ''আমি ক্ষমা করবার কে, মা? ভগবান যদি আপনাকে ক্ষমা করেন তাহলেই হল। আর তাছাড়া আমারই ভাগ্যের দোষ। ভাগ্য মানি আর না মানি, একজন সর্বশক্তিমান পরম নিয়ন্তা যে আছেন, সে-বিষয়ে তো আমার কোনও সন্দেহ নেই। তিনিই তো সব করাচ্ছেন আর আমরা করছি। আপনার পা দু'টো যিনি কাটিয়েছেন, তিনিই আবার আমার স্ত্রীকেও নিয়েছেন। আবার তিনিই আমার ছেলেদের নিয়ে এই খেলা খেললেন। যতদিন বাঁচব ততদিন তাঁর এই লীলা-রহস্য দেখব আর অবাক হয়ে যাব। আমার মতো সংসারী জীবের পক্ষে আর তো কোনও-কিছু করণীয় নেই। আজকে আপনার কাছে এসে আমার সে-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল।

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার
ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই
ভারী মজার ! এই একটা উপহার
আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে।
ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো
ঐখানে !
ভাগ্যিস্, মার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল।
অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ
দিই—আমার জমা পয়সা বছর
বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।
UCO/CAS-69/80 BEN

আমরা এখন চলি। প্রার্থনা করি আপনার ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন।"

এবার সবাই উঠলেন। বাইরে চন্দ্রভানুবাবুর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই উঠে বসতে গাড়ি রওনা হল।

রাত তখন বেশ গভীর হয়েছে। সকলের মুখই তখন গম্ভীর। জীবনের গোলকধাঁধায় পড়ে সবাই এক-এক সময়ে মেকি জিনিসকেই খাঁটি বলে ভুল করে, আবার হয়তো কারো-কারো সে-ভুল ভেঙেও যায়। কিন্তু এমন লোকও আছে, যাদের কোনও দিনই সে-ভুল ভাঙে না। আজ যে জ্যোতিকে আর দেবুকে পাওয়া গেছে, অনেক পথ পরিক্রমার পরে আবার যে তারা নিজেদের বাড়িতে এসে পৌঁছেছে, এতেই সকলের আনন্দ।

সাধুবাবা একলা শুধু বাড়িতে ছিলেন।

গাড়িটা বাড়িতে এসে পৌঁছতেই সবাই সাধুবাবার ঘরে এসে পড়ল। যা-যা ঘটনা ঘটেছে, সবই সাধুবাবাকে জানানো হল। সাধুবাবা সবই শুনলেন।

সাধুবাবা বললেন, ''আপনাদের তো সব প্রশ্নের জবাব মিলে গিয়েছে।''

জয়রামবাবু বললেন, ''কিন্তু একটা উত্তর শুধু মেলেনি সাধুবাবা।''

''কী উত্তর?"

''আমি জানতুম না যে, আমার যমজ পুত্র হয়েছিল। এখন জানলুম ওই দেবু আর ওই জ্যোতি দু'জনেই আমার ছেলে। এখন আপনি বলে দিন কে জ্যোতি আর কে দেবু?"

সাধুবাবা দেবুর দিকে আঙুল দিয়ে বললেন,''এই হচ্ছে জ্যোতি।''

''তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আর এই যার পা আমি ঠিক করে দিয়েছি, এই-ই হচ্ছে দেবু। চন্দ্রভানুবাবু একেই জ্যোতি মনে করে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।''

এবার সকলের সব সন্দেহ দূর হল।

বাড়িময় আনন্দের উৎসব-কলরোল উঠল। আজ আর কারো মনে ক্ষোভ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল চন্দ্রভানুবাবু কাকে তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যাবেন? জ্যোতিকে না দেবুকে? আর সূর্যনারায়ণবাবুই বা কাকে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর অবর্তমানে উত্তরাধিকারী করে যাবেন?

সকলেই বললে, "সকলের সব সম্পত্তি দু'জনেই পাবে। দু'জনেই এই তিনজনের অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এতদিন পরে যখন সবাই একসঙ্গে এসে এক জায়গায় মিলেছে, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। কেউ আর কাউকে হারিয়ে যেতে দেবে না।"

জয়রামবাবু জ্যোতিকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "দেবুকে তোমার নিজের ভাই বলে মেনে নিতে কখনও কোনও আপত্তি করবে না তো?

জ্যোতি বললে, "না!"

তারপর দেবুকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "জ্যোতিকে তোমার নিজের ভাই বলে মেনে নিতে কখনও কোনও আপত্তি করবে না তো?''

দেবু বললে, ''না।''

চন্দ্রভানুবাবু জয়রামবাবুর দুই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, ''দাদা, তুমি আমায় ক্ষমা করো।''

জয়রামবাবু চন্দ্রভানুকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ''তুইও আমাকে ক্ষমা কর ভাই। ছোটবেলায় তোকে কী বলেছি আর কী না-বলেছি, তা মনে করে রেখে কষ্ট পাসনি ভাই। আমাকে ক্ষমা কর তুই।''

সূর্যনারায়ণবাবু জয়রামবাবুর দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন, ''তুমিও আমায় ক্ষমা করো ভাই, আমি না-জেনে তোমার ওপর অনেক অপরাধ করেছি।''

জয়রামবাবু সূর্যনারায়ণবাবুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দের আতিশয্যে

আগামী সংখ্যা থেকে

বিমল করের

দারুণ রোমাঞ্চকর উপন্যাস

সিসের আংটি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

একেবারে শুরুর থেকেই

পড়তে শুরু করো।

দুইজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মাঝরাত্রে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন সাধুবাবার ঘুম নেই। সাধুবাবা নিজের বিছানা থেকে উঠে বসলেন। জয়রামবাবু দুদিন তাঁকে খুব আরাম দিয়েছিলেন।

ভাল বিছানা, ভাল চাদর, ভাল কম্বল। সাধুবাবা সব কিছু ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর টিপিটিপি পায়ে ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরোলেন। সদর দরজায় খিল দেওয়া ছিল। সাধুবাবা খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বাইরে তখন নিশুতি রাত।

হঠাৎ কার পায়ের আওয়াজ পেতেই সাধুবাবা দেখলেন, পেছনে জ্যোতি দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, "তুই?"

জ্যোতি জিজ্ঞেস করলে, "তুমি চলে যাচ্ছ সাধুবাবা?"

সাধুবাবা বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তুই এখনও জেগে আছিস কেন?"

জ্যোতি বললে, "আমি ঠিক জানতুম তুমি এ-বাড়িতে আর থাকবে না, চলে যাবে। তাই আমার ঘুম আসছিল না। আমিও আর এ-বাড়িতে থাকব না, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

সাধুবাবা বললেন, "সে কী রে, তোদের দুই ভাইয়ের তো এখন অনেক টাকা হল। এ-অবস্থায় তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি? বাড়ি ছাড়তে তোর কষ্ট হবে না?"

জ্যোতি বললে, "এত দেখার পরও আর কখনও বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে?"

"কিন্তু ওরা সবাই ভাববে আমি তোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেছি।"

"তা যা ইচ্ছে ভাবুক, আমি তোমার সঙ্গে যাবই।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে থাকলে তো অনেক কষ্ট, তা তো দেখেছিস। এত টাকার মালিক হয়ে এত কষ্ট করতে যাবি কেন মিছিমিছি?"

জ্যোতি বললে, "যদি টাকার মোহে বাড়িতেই থাকব তাহলে এতদিন তোমার সঙ্গে থেকে থেকে কী শিখলুম?"

সাধুবাবা বললেন, "তাহলে চল।"

বাড়ির সদর দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে সাধুবাবা রাস্তায় নামলেন। সঙ্গে জ্যোতি। নির্জন রাস্তা। শহরের কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাধুবাবা বললেন, "একটু পা চালিয়ে চল্, সূর্য ওঠবার আগে কলকাতার নাগালের বাইরে যেতে হবে।"

দু'জনের ইচ্ছে যেন তখন শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ায় উড়ে চলেছে। হাঁটতে-হাঁটতে কালীঘাট পেরিয়ে চৌরঙ্গি। তারপর পশ্চিম মুখ করে সোজা হাওড়ার দিকে। তারপর দেখা গেল হাওড়ার ব্রিজ আর গঙ্গা। পেছন দিকে একটু-একটু করে আকাশের কালো অন্ধকার ঝাপসা হয়ে উঠেছে। এবার বোধহয় সূর্য উঠবে। রাস্তায় একটা দু'টো গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। কোলাহলময়ী হয়ে উঠবে কলকাতা একটু পরেই।

হঠাৎ সাধুবাবা বললেন, "তোদের রবি ঠাকুরের একটা গান গাইছি, শোন্।" বলে গাইতে লাগলেন—

তার অন্ত নাই গো যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ

খানিক পরে জ্যোতিও সাধুবাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল—

তারে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ...

সাধুবাবা আবার গাইতে লাগলেন—

কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।...

সাধুবাবাও চলতে লাগলেন, জ্যোতিও সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল। দু'জনেরই মনে হল এই চলা যেন আর তাদের শেষ হবে না। দু'জনেই যেন বন্ধন থেকে মুক্তির আস্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

গান গাইতে গাইতে আর চলতে চলতে জ্যোতির মনে হল, সে যেন এই পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থেকেও মুক্ত হয়ে গিয়েছে। সে এই বিশ্ব-চরাচরের সুখ-দুঃখ-আনন্দবিস্বাদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। সেই একাকার হওয়ার আনন্দের যেন আর অন্ত নেই। একদিন আনন্দ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিল, আবার আর-এক মহা-আনন্দের দিকেই সে এগিয়ে চলেছে। তার অন্ত নাই গো নাই।

(সমাপ্ত)

আজব জিনিস

তারাপদ রায়

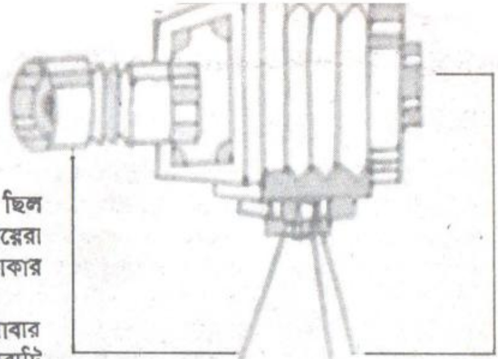

আমাদের একটা দুর্দান্ত ক্যামেরা ছিল ছোটবেলায়। ক্যামেরাটি আমরা ভাইয়েরা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের বাবার কাকার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

আসলে ঐ ক্যামেরাটি আমার বাবার কাকারও নিজের জিনিস ছিল না। ক্যামেরাটি আগে ছিল এক পাটগুদামের সাহেবের। পাটের জেলা ছিল আমাদের, পাটের সাহেবে গিজ-গিজ করত আমাদের শহর-গঞ্জ। একবার বিলেত থেকে কী এক চিঠি এল এক সাহেবের। চিঠি পড়ে খেপে গেলেন তিনি। নদীর ধারে সাহেবের বাংলো, বাংলোর ছাদে উঠে তিনি তাঁর সব জিনিসপত্র, ঘড়ি-ক্যামেরা, জামা-কাপড় জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অনেক লোক মজা দেখছিল, তার মধ্যে আমার বাবার কাকাও ছিলেন। সবারই ইচ্ছে হচ্ছিল জলে নেমে তুলে নেয়। কিন্তু সাহেবের এক হাতে বন্দুক ছিল, তাই কেউ সাহস পাচ্ছিল না। অবশেষে সাহেব যখন বন্দুকটাও জলে ফেলে দিলেন তখন একসঙ্গে বহুলোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বাবার কাকা ছিলেন দক্ষ সাঁতারু, তিনি এক ডুব-সাঁতারে এক হাতে ক্যামেরাটি অন্য হাতে বন্দুকটি তুলে বাড়ি নিয়ে আসেন।

বন্দুকটির কথা পরে, এখন ক্যামেরাটির কথা বলি।

আদ্যি যুগের বাক্স-ক্যামেরা সেটা। কালো চামড়া-মোড়া একটা মাঝারি বিস্কুটের টিনের আকার ছিল সেটার, কাঁচ-লাগানো মুখের কাছটা চোঙা-মতো, ওজনও ছিল দুই-তিন সের। ওজনের জন্যে ক্যামেরাটা নিয়ে একটার বেশি ছবি তুললেই হাত টনটন করত, তখন ছবি তোলার জন্যে আর এক-জনকে ডাকতে হত। আর একটা ব্যাপার ছিল, স্টার্টার টেপার পরে মিনিট-খানেক খট-খট করে শব্দ হত জোরে-জোরে, তাই ছবি তোলা ছাড়াও অন্য কাজে ক্যামেরাটার ব্যবহার কাকেরা ক্যামেরাটিকে সাংঘাতিক ভয় পেত, ওটি তুলে শাটার টিপলেই সন্ত্রস্ত হয়ে কা-কা করে ঘণ্টা তিনেকের মতো নিরুদ্দেশ হত। ফলে বাড়িতে যখন আমসত্ত্ব বা ডালের বড়ি দেওয়া হত তখন যন্ত্রটা খুবই কাজে লাগত।

ফোটোও খারাপ উঠত না। তবে ছাতা পড়েছিল, তাই একটু ঝাপসা হত ছবি। একটা অসুবিধা ছিল, কিছু নড়লে-চড়লে তার ছবি ধরা পড়ত না। আমাদের একটা কুকুরের ছবি তুলেছিলাম, কুকুরটা তখন লেজ নাড়ছিল, সুন্দর ফোটো এসেছিল কুকুরটার, কিন্তু লেজটি অদৃশ্য। ঘূর্ণমান লেজটি ছবিতে আসেনি।

আমাদের ওখানে ক্যামেরাটির ফিল্ম পাওয়া যেত না, কলকাতা থেকে নিয়ে যেতে হত। এক সময় ফিল্মের অভাবে এবং অব্যবহারে ক্যামেরাটি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। তখন ওটা কাছারি - ঘরের একটা আলমারির মাথার উপরে তোলা ছিল। একদিন একটা ষাঁড় উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ শিং উঁচিয়ে আমাদের কাছারি ঘরে ঢুকে পড়ে। মুহুরি-বাবু হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ঐ ক্যামেরাটি তুলে ধরেন। ষাঁড়টা চোখ তুলে বিচিত্র যন্ত্রটা দেখে কেমন থতমত খেয়ে কী ভেবে শিং নামিয়ে শান্ত হয়ে ঘরের থেকে চলে যায়। সেই থেকে মুহুরিবাবু ক্যামেরাটিকে নিয়মিত ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করতেন, বলতেন, "আমার বাবা, আমার রক্ষাকর্তা, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।"

ফুল-চন্দনে কালো ক্যামেরাটি খুব সুন্দর মানাত। মুহুরিবাবু বুড়ো হয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় ক্যামেরাটি নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি বহুদিন বিগত হয়েছেন, কিন্তু ক্যামেরাটি নাকি এখনও তাঁদের দেশের বাড়িতে আছে। তাঁর ছেলেদের কাছে শুনেছি, সেটি এখন তাঁদের গৃহদেবতা, ক্যামেরাটির নতুন নাম হয়েছে ক্যামেরেশ্বর।

গুহার মধ্যে গুপ্ত ছিল
চোরাই মোহর হাজার কিলো।
আলি বলেন, হায়রে হায়,
মানুষ কি আর মোহর খায় ?
সোনার মোহর ঘোড়ার ডিম
জলদি লে আও আইসক্রীম।
মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !
Kwality
আইসক্রীম

মাৎস্যন্যায়

সৌরেন বসু

নেই নেই আধলা
বাটা, রুই, কাতলা
চিংড়ি সে বাগদা
পারি না তো কিনতে।

নাড়ে শুধু গোঁপ সে
দেখি চোখে তোপসে,
পারি না তো মৌরলা
চাঁদা, পুঁটি চিনতে।

দেখি না তো আর সে
চকচকে পারশে
চ্যালা আর ইলিশের
রুপোলি সে রংচং।

শোল, কই, ট্যাংরা
নাচে শিঙি, চ্যাং-রা ;
মনে মনে জপি শুধু—
'মৎস্যং মৎস্যং !'

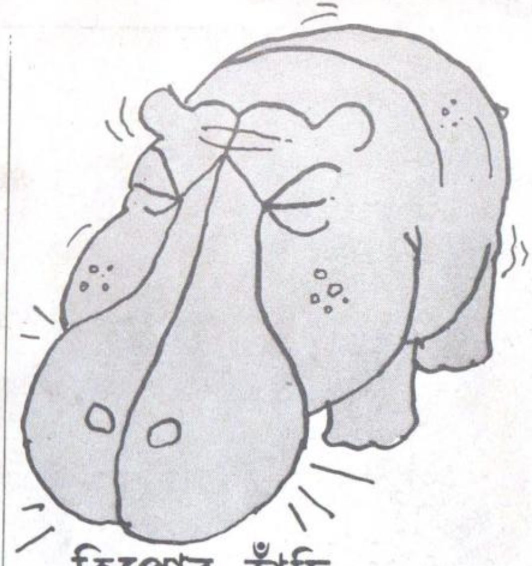

হিপোর হাঁচি

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

চিড়িয়াখানায় হিপোর সাথে
ভাব করেছে একটা মাছি।
হিপোর মাথায় ডিগবাজি খায়
সারাটা দিন নাচানাচি
করে, এবং সবাইকে সে
ডেকে বলে, দ্যাখ রে এসে,
মস্ত হিপোর বন্ধু হয়ে
আমি কেমন সুখেই আছি!

সেদিন হিপো আনমনা যেই
হঠাৎ সে কোন্ ফাঁকে
ছোট্ট মাছি সুড়ুত করে
সেঁধোল তার নাকে।
নাকের ভেতর ফুড়ুত-ফুড়ুত
যেমনি নাচানাচি,
বেজায় জোরে শব্দ করে,
অমনি হিপোর হাঁচি।
তোপ-দাগা ঐ হাঁচির ঠেলায়
কোথায় গেল মাছি ?
মিসিং স্কোয়াড খুঁজছে তাকে
ধুপগুড়ি, তোপচাঁচি।

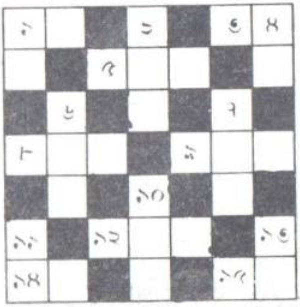

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পিঙ্গলবর্ণ। (৩) বাঘ-ভালুকের বাসস্থান। (৫) ঝাউগাছ। (৮) জেলখানা। (৯) বাজনা-বিশেষ। (১২) শামুক। (১৪) পবিত্র ধাতু। (১৫) লুঠেরা জাতি।

উপর-নীচ : (১)নবজাত। (২) কথায় বলে, ঘোড়া থাকলে এই জিনিসের অভাব হয় না। (৪) আমাদের দেশের জননী কে? (৬) অভিনয়ের বিষয়। (৭) বর্ষা। (১০) শেয়াল। (১১) অবলম্বন ছাড়া যে উপরে উঠতে পারে না। (১৩) চিহ্ন।

ছক পূরণ করার পর লক্ষ করো শব্দগুলোর মধ্যে কী-কী মজা রয়েছে। চার কোণের ছোট ছোট শব্দগুলো ওলটালে অন্য অর্থ হয়, বাকি শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমিল—যেমন, পাশাপাশি যদি হয় বন্দুক উপর-নীচে হবে কন্দুক।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ফা	ল্গু	নি	■	আ	র	বি
ত	■	■	পু	■	■	ট
না	গা	■	র্ব	■	ক	ঙ্ক
■	গ	ঙ্গা	ফ	ড়ি	ং	■
অ	রি	■	ল্গু	■	স	খা
ঙ্কু	■	■	নী	■	■	ণ্ড
র	জ	নী	■	আ	হ	ব

ছোট্‌কা সেদিন আপিস থেকে ফিরেই ডেকে পাঠাল আমায়। চিলেকোঠায় পৌঁছে দেখি ছোট্‌কা খাতা খুলে কী-একটা হিসেব মেলাচ্ছে আর আপন মনেই হেসে যাচ্ছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ইশারায় বসতে বলল।

হিসেব মিলল কি না কে জানে, মিনিট কয়েক বাদে খাতাটা বন্ধ করে ছোট্‌কা আমার দিকে ফিরে তাকাল। মুখটা এখনও হাসি হাসি, বলল, ‘আজ এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখলাম সতুবাবু। উফ্‌, ভাবলে এখনো হাসি পাচ্ছে।’

কী যে দেখেছে ছোট্‌কা, কেন যে হাসি পাচ্ছে, আমি কিছুই জানি না। চুপ করে তাকিয়ে থাকি ছোট্‌কার দিকে। ছোট্‌কা নিজেই বলতে লাগল, ‘গিয়েছিলাম এক বন্ধুর দোকানে। সে দোকানে একটা ওজন নেবার মেশিন রয়েছে। এক ভদ্রমহিলা সেই মেশিনে ওজন নিতে এলেন, সঙ্গে একটা কুকুর, আরেকটি ছোট্ট ছেলে। তিন জনে মিলে এক সঙ্গেই উঠে পড়লেন মেশিনটার ওপরে। ভদ্রমহিলা দশ পয়সা ফেলে দিলেন, ওজনের কার্ড বেরিয়ে এল, কার্ডটা নিয়ে নেমে গেলেন। সে এক দারুণ মজার দৃশ্য। আমি থাকতে না-পেরে ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কত উঠল ওজনে?’ ভদ্রমহিলা সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, ‘৬৮ কিলো।’ আমি আবার প্রশ্ন করলাম, ‘এ থেকে বুঝতে পারবেন, কার কত ওজন?’ উত্তরে ভদ্রমহিলা বললেন, ‘পারব।’ আমি অবাক। বিনীত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম ‘কী করে, যদি একটু বুঝিয়ে বলেন!’ ভদ্রমহিলা বললেন, পরিষ্কার ধাঁধার মতো রহস্য মিশিয়ে, ‘কুকুর আর ছেলেটির ওজন মিলিয়ে যা হয়, আমার ওজন তার থেকে চল্লিশ কিলো বেশি। আর কুকুরের ওজন ছেলেটির ওজনের থেকে শতকরা ষাট ভাগ কম। এ থেকেই বার করে নিন-না আমাদের কার কত ওজন। পারবেন না?’ সে অঙ্কটাই এতক্ষণ ধরে করলাম সতুবাবু। আমার হিসেব মিলে গেছে। এবার একটু তুমি বলো, কার কত ওজন?

বুঝলাম, এবারের প্রথম ধাঁধা এভাবেই দিল ছোট্‌কা। দ্যাখো তো, তোমরা বার করতে পার কিনা উত্তরটা!

দ্বিতীয় ধাঁধা। দশ কিলোর সঙ্গে মাছটার আসল ওজনের অর্ধেক যোগ দিলে পুরো মাছটার ওজন পাওয়া যায়। পুরো মাছটার ওজন কত?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

পনীৎলোল

চতুর্থ ধাঁধা ॥ কখন উত্তর-এর উল্টো দক্ষিণ হয় না?

গতবারের উত্তর (১) ‘আজ কি বৃষ্টি হচ্ছে?’ অথবা ‘আপনি কি বাঘ’—এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন করতে হবে। এর উত্তরে গুহাবাসী বলবে ‘হ্যাঁ’, কেননা তারা সবসময়ই মিথ্যে কথা বলে। আর এর উত্তরে ‘না’ বললে বুঝতে হবে, উত্তরদাতা বৃক্ষবাসী। (২) ১৮ বছর। (৩) রোজনামচা। (৪) মা।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

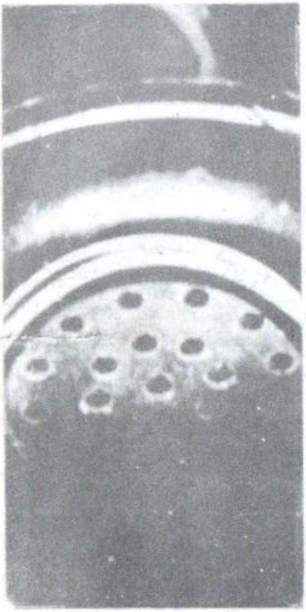

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল থার্মোমিটারের ফোটো

উত্তর বটে

প্রঃ ঘোড়া আর জেব্রার সত্যিকারের তফাতটা কী?

উঃ কোনো তফাতই নেই, ঘোড়াই স্লীপিং স্যুট পরলে জেব্রা হয়।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথ কি জীবনে কখনো ফুটবল খেলেছিলেন?

উঃ বোধহয় খেলেছিলেন, তাঁর একটা গানে, লেখা আছে, 'বল দাও মোরে বল দাও।'

প্রঃ কী ধরনের লোক কখনো কারো কাছে নিচু হয় না?

উঃ বিরাট ভুঁড়িওয়ালা লোক।

প্রঃ কোন্ জিনিস পুরনো হয়ে গেলেও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার উপায় নেই?

উঃ ব্যুমেরাং।

সুসেন

মজার খেলা

চোদ্দটি দেশলাই-কাঠি দিয়ে দারুণ মজা করে ঠকানো যায় বন্ধুদের। এটা ঠিক খেলা বলা যায় না, একটু ঠাট্টার মতোই, কিন্তু খুব মজাদার। একটা দেশলাই-বাক্স থেকে প্রথমে চোদ্দটি দেশলাই-কাঠি বার করে টেবিলে রেখে বন্ধুদের ডাকো। তারপর বলো, "সাধারণত, এক-একটা দেশলাই-কাঠি হয় দেড় ইঞ্চি মাপের। টেবিলে চোদ্দটি দেশলাই-কাঠি রয়েছে। অর্থাৎ মোট রয়েছে প্রায় একুশ ইঞ্চি। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই একুশ ইঞ্চিকে এক গজ বানাতে পারো?"

দেখবে, প্রশ্নটাই দু-তিনবার শুনতে চাইবে বন্ধুরা। তুমি বার-বারই একই রকম ভাবে সমস্যাটা বলবে। চোদ্দটি দেশলাই-কাঠি রয়েছে, এক-একটি কাঠির দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ইঞ্চি। অর্থাৎ মোট রয়েছে একুশ ইঞ্চি। কেউ কি একুশ ইঞ্চিকে এক গজ বানতে পারো?—তোমার বক্তব্য সবসময়ই এইরকম ভাষায় যেন হয়।

না জানা থাকলে, কেউই পারবে না। তুমি তখন করে দেখাও। কী করে দেখাবে? তাহলে নীচের উত্তরটা দেখে নাও

চোদ্দটা দেশলাই-কাঠিকে নীচের ছবির মতো সাজিয়ে দাও, তাহলেই দিব্যি, 'এক গজ' হয়ে—যাবে—

কী, হয়নি?

মজারু

হাসিখুশি

কোনো মাঠে গিয়ে গোরু গোনার সহজ উপায় হল, বসে বসে গোরুর পাগুলো গুনে ফ্যালো, তারপর তাকে চার দিয়ে ভাগ দিলেই গোরুর সংখ্যা পেয়ে যাবে

এক মহিলা কুকুর নিয়ে বাসে উঠে কণ্ডাক্টরকে বললেন, "দেখুন ওর টিকিট কাটছি, ও সীটে বসে যাবে।"

কণ্ডাক্টর বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু ওকে অন্যান্য যাত্রীর মতো বসতে হবে। সীটের উপর পা তুলে বসতে দেব না।"

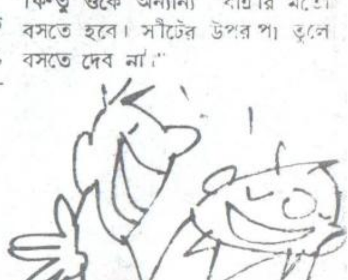

মূকাভিনয় দেখে বেরোবার পথে একজন মুগ্ধ দর্শক আরেক-জনকে বলল, "অভিনেতাটি যদি কথা বলতে পারত, তাহলে একেবারে ফাটিয়ে দিত।"

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে; পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিস্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

দাঁতের পুরোপুরি যত্ন নেবার জন্যে
কোলগেট ট্রাইগার্ড টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...
এটি দাঁতকে তিন ভাবে সুরক্ষা করে

1. দাঁতের এনামেল সুরক্ষা করে।
2. দাঁত কোনও ময়লা জমতে দেয় না।
3. মাড়ির সুরক্ষা করে।

DC.G.74 BN

॥ ১০ ॥

গভীর রাতে মেজর মুখার্জি ঘরের মেঝেতে বিশাল একটা ম্যাপ বিছিয়ে বসলেন। সুধীর ভরসায় থাকলে তানজানিয়াতে হিরের সন্ধানে যাওয়া হবে না। ফুটো হার্ট নিয়ে সুধী কালাহারি মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবে না। একলাই যেতে হবে। মেজর মুখার্জি ম্যাপে আফ্রিকার তলার দিকে নেমে এলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম দিকে এই তো স্কেলিট্যান কোস্ট। কঙ্কাল তটভূমি।

"ছোট দাদু, আসব?"

মেজর মুখার্জি চোখ তুলে তাকালেন। দরজায় সুকু। চার্চের ঘড়িতে বারোটা বাজছে।

"তুমি এখনও ঘুমোওনি? রেবেকা কেমন আছে এখন?"

"মায়ের পাশে ঘুমোচ্ছে। আপনি ম্যাপ দেখছেন কেন?"

"আমাকে যে অনেকদূর যেতে হবে দাদু, ভাগ্যের সন্ধানে। এই আমার শেষ লড়াই।"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন? আমার বাইনোকিউলার আছে, এয়ারগান আছে, ছররা আছে, জলের বোতল আছে, বুট জুতো আছে।"

"সাহস আছে?"

"আমার ভীষণ সাহস আছে।"

"আচ্ছা সুকু, এখানে ফোলডিং কোদাল পাওয়া যায়!"

"ফোলডিং ছাতা হয়, কোদাল হয় বলে তো শুনিনি।"

"বিজ্ঞানের যুগে সব হয় সুকু। এখানে ভাল কামারশাল আছে?"

"হ্যাঁ, যেখানে হাট বসে, সেখানেই আছে উঁচিতলালের কামারশাল।"

"দেখি, কাল সকালে একবার যেতে হবে। একটা ভাল কুকুর চাই।"

"কেন, অ্যালবার্ট আছে, আমাদের অ্যালবার্ট। ওর সাংঘাতিক বুদ্ধি!"

মেজর মুখার্জি আবার ম্যাপ নিয়ে পড়লেন। সুকুও হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাল পেনসিল দিয়ে ম্যাপের একটা জায়গায় গোল দাগ মারলেন। সুকু বললে, "ওইখানে হিরে পাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, দাদু। এই হল স্কেলিট্যান কোস্ট। একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে আশি মাইল বিস্তৃত সাংঘাতিক মরুভূমি, কালাহারি।"

"স্কেলিট্যান কোস্ট নাম হল কেন? ওখানে কি কঙ্কাল পড়ে আছে?"

"এই তটভূমিতে বহু যুগ ধরে বহু মানুষ জাহাজে, নৌকোতে নামার চেষ্টা করেছে। যারাই চেষ্টা করেছে, তারাই মরেছে। দক্ষিণ থেকে পুবে সাঁসাঁ করে অনবরতই ঝড় বইছে। বর্শার ফলার মতো বালি উড়ছে। পালিশ করা কিংবা রঙ করা ধাতুর টুকরো ধরে রাখলে একঘন্টায় ওই বালির ঘষায় সব রঙ উঠে মেটাল বেরিয়ে পড়বে। ওই তটভূমিতে দুশো তিনশো বছর আগেকার বড় বড় জাহাজের কঙ্কাল এখনও কাত হয়ে পড়ে আছে। সাহসী নাবিকদের কঙ্কাল বালির তলায় চুন হয়ে গেছে। কোনও মানুষ ওখানে গেলে বেঁচে ফিরে আসে না।"

"তাহলে আমরা কী ভাবে যাব?"

"আমরা সমুদ্রপথে যাব না। গেলেও আমরা ডার্বানে নামব, সেখান থেকে জোহানসবার্গ, মাফেকিং হয়ে কালাহারি। একটা গগলস চাই।"

"দাদার গগল্স আছে, আপনাকে চেয়ে দেব?"

"আমার চোখে লাগবে? আমার মুখটা তো একটু বড়!"

"এখন আনব?"

"এত রাতে? থাক। কাল সকালে হবে। মাফেকিংয়ে একটা উট ভাড়া করব, তারপর কালাহারির ভেতর দিয়ে চলে যাব বাটসোয়ানা। ওখানে কিছু করতে পারব না। ডিবিয়ার কোম্পানি সব দখল করে বসে আছে। উইনধোকার পাশ দিয়ে একেবারে সমুদ্রের তীরে। লম্বা ফলাঅলা একটা ছুরি

চাই। ছোট্ট একটা তাঁবু ফেলব আর রোজ সকাল বেলা সেই ছুরির ফলা দিয়ে বালি উসকে উসকে হিরে খুঁজব। প্রথমে ছোট ছোট পাব, তারপর বলা যায় না হোপ ডায়মন্ডের মতো বিশাল একটা হিরেও পেয়ে যেতে পারি ভাগ্য ভাল হলে। সুধীটা সঙ্গে থাকলে কত ভাল হত?"

"হোপ ডায়মন্ড কী দাদু?"

"উরে বাপ রে, রাত্তির বেলা ওর নাম কোরো না। সারা পৃথিবীতে ওই হিরের জন্যে কম খুনখারাপি হয়েছে! মৃত্যু, আত্মহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ। অভিশপ্ত হিরে। রংটা হল স্টীল ব্লু। ওজন ৪৫.৫২ ক্যারাট। ক্যারাট কাকে বলে জানো? একটা ক্যারব বিজের ওজনকে বলে ক্যারাট। ওজন ১/৪২ আউনস অথবা ১/৫ গ্রাম। তার মানে দশ গ্রাম ওজন। এই বিখ্যাত হিরে, বিখ্যাতই বলো আর কুখ্যাতই বলো, এখন আছে এক মার্কিন ধনকুবেরের হাতে, নাম এভালিন ওয়ালশ ম্যাকলিন।"

চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটা পাখি ডেকে উঠল। গা ছমছম করানো ডাক। দূরে একপাল কুকুর কাঁদছে। মেজর মুখার্জি বললেন, "ওই কালাহারিতে কত প্রেত ঘুরছে? হিরের সন্ধানে গিয়ে পথ হারিয়ে, গরমে, না খেয়ে জল না পেয়ে তিল-তিল করে মরেছে।"

"অমন একটা জায়গায় নাই বা গেলেন ছোট দাদু। কী হবে হিরে?"

"তুমি বুঝবে না সুকু। জীবন তো পুষে রাখার জিনিস নয়, জীবনকে উড়িয়ে দিতে হয় পাখির মতো। কত দেশ, কত বন, উপবন, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, জীবন, জীবিকা, অ্যাডভেঞ্চার! তোমার হাই উঠছে, যাও, এবার শুয়ে পড়ো। কাল সকালে মনে থাকে যেন বেড়াতে যেতে হবে। ম্যাপের ওপর মেজর আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রাত প্রায় একটা হল। সুকু উঠে পড়ল। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল সারা ডালটনগঞ্জ ঘুমিয়ে আছে। শুধু বাবার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত বাবা পড়াশোনা করেন। এক আকাশ তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলছে।

সুকু বাগানে নামল। একটু ঘুরে নিজের ঘরে যাবার ইচ্ছে। অনেক ফুল আছে যা শুধু রাতেই ফোটে। ফুল যখন ফোটে তখন কি কোনো শব্দ হয়? সারা বাগানটা যেন ফিসফিস করছে। সুকু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "কে?" সামনেই একটা সাদা মূর্তি। সুকুকে দেখে হনহন করে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সুকু আরও জোরে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি, দাদু?"

মেজর মুখার্জি বেরিয়ে এসেছেন, "কে সুকু?"

"কোনও উত্তর দিচ্ছেন না।"

বাবাও বেরিয়ে এসেছেন, "কে সুকু?"

"বোধহয় দাদু?"

"দাদু, সে কী? দাদু কেন এখন বেরোবেন?"

মেজর মুখার্জি সাদা মূর্তিটাকে অনুসরণ করলেন। গেট খুলে মূর্তি ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। মেজর ডাকছেন, "সুধী, সুধী, কোথায় চলেছ? এত রাতে তুমি একা-একা কোথায় চললে? সুধী সুধী?"

সুকু দৌড়ে দাদুর ঘরে গেল। রাজ্যেশ্বরীও উঠে পড়েছেন। সুকু অবাক হয়ে গেল, দাদু তো শুয়েই আছেন।

"মা দেখবে এসো, দাদু তো শুয়েই আছেন। তবে উনি কে?"

রাজ্যেশ্বরী ছুটে এলেন, "বাবা, বাবা।"

কোনও সাড়া নেই। ডাক্তার মুখার্জি এসেছেন, "কী হল। সাড়া নেই?"

রাজ্যেশ্বরী কাঁদো-কাঁদো, "বাবা, বাবা। দেখে যাও গাটা বরফের মতো ঠান্ডা।"

ডক্টর মুখার্জি নাড়ি দেখলেন। সব শেষ। স্ত্রীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মৃত্যুর কোনও সান্ত্বনা নেই। রুকু আর সুকু স্তব্ধ। দু চোখে জল। দাদু নেই। কেউ নেই। বাগানের গেট খুলে কে চলে গেলেন? রাজ্যেশ্বরী ফুলে ফুলে কাঁদছেন। এই তো সন্ধেবেলা ভালই ছিলেন। কত কথা হল। রাতের খাবার খেলেন, ওষুধ খেলেন।

চার্চের ঘড়িতে রাত দুটো বাজল। রেবেকা খুব ঘুমোচ্ছে জ্বরটা একটু কমেছে।

*

পুলিস অফিসার বললেন, "দেখুন আমরা গত তিন দিন সারা ডালটনগঞ্জে চুঁড়ে ফেললুম কিন্তু কোথাও সেই ভদ্রলোকের সন্ধান পেলুম না। আপনারা একটা ছবিও দিতে পারছেন না। একটি ছবি পেলে আমাদের কাজের খুব সুবিধে হত।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "পাইপ আর একপাটি জুতো যে জায়গায় পেলেন, সেই জায়গাটা আর একটু ভাল করে দেখলে হত না?"

"খুব ভাল করে দেখেছি। একপাশে পাহাড় আর একপাশে গভীর খাদ। বহু নীচে নদী বয়ে চলেছে, কাঁটাঝোপ। আর কীভাবে দেখব বলুন? আমার মনে হয় ভদ্রলোক কলকাতায় চলে গেছেন।"

"একপাটি জুতো পরে কেউ কোথাও যেতে পারে?"

"তা হলে খালি পায়ে গেছেন। কলকাতার ঠিকানাটা দিতে পারেন?"

ডক্টর মুখার্জি উঠে পড়লেন। এমন একজন মানুষের সন্ধান চাই, যাঁর ছবি নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই। পাহাড়ের তলার একটা ঝোপে পাইপ আর একপাটি জুতো। মানুষটা কোথায়? পাহাড়ের মাথায় না খাদে? পাহাড়ের রেঞ্জ এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছে। কে খুঁজবে সেখানে। খাদটা এত গভীর যে কেউ শখ করে নামবে না ঠেলে ফেলে না দিলে।

আগামী সংখ্যা থেকে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

হাসির-তুফান-তোলা উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

একেবারে শুরুর থেকেই

পড়তে শুরু করো।

ডক্টর মুখার্জি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। পাহাড়ের দিকেই একবার যাবেন। নিজের দেখা আর অন্যের দেখায় অনেক তফাত। রাস্তা ক্রমশ উঁচু হতে হতে আবার ঢালু হয়ে নীচের দিকে নামছে। আবার উঠছে ওপরে। মাঝে-মাঝে আদিবাসীদের গ্রাম। রাখাল চলেছে ছাগল আর ভেড়া নিয়ে। গাড়ির শব্দে ছাগল ছুটছে।

এবারে দুপাশে খালি পাথর আর বন। জৈনদের একটা মন্দির পেরিয়ে গেলেন। গাড়িটা একপাশে রেখে হাঁটা পথ ধরলেন। এ-পথে গাড়ি আর চলবে না। দূরে বহু পাখি উড়ছে। আকাশে চক্কর মারছে গোল হয়ে। দেখেই বুঝলেন শকুন উড়ছে। শকুন মানেই মৃত্যু, মৃতদেহ। বুকটা ছাঁত করে উঠল।

ডক্টর মুখার্জি পায়ে পায়ে খাদটার ধারে এলেন। ধাপে ধাপে নেমে গেছে বড় গাছ ছোট গাছ। ডালে ডালে শকুন বসে আছে। কিছু নেমে গেছে আরও তলায়। খ্যাখ্যা আওয়াজ করছে। কিছু উড়ছে, কিছু উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। নির্জন পাহাড় আর বনানীতে যেন তান্ডব চলছে। মৃতদেহ-লোভী কিংবা মানুষ!

ডক্টর মুখার্জি স্তব্ধ হয়ে খাদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক নীচে প্রবাহমান পাহাড়ি নদীর জল রোদে চিকমিক করছে। জোরে হাওয়া বইলে নাকে একটা গন্ধ এসে লাগছে। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে মাঝে-মধ্যে একটা দুটো আলগা পাথর গড়িয়ে

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুন ধোলাই শক্তি–চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

পড়ছে। সেই অসীম নির্জনতা, উদ্ধত পাহাড়, শকুনের পাক খাওয়া, লাট খাওয়া খ্যাখ্যা, সব কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে ডক্টর মুখার্জির মনে হল, জীবন বড় ভীষণ।

গাড়িটাকে ঘুরিয়ে তিনি আবার থানার দিকে ফিরে চললেন।

এদিকে রাজেশ্বরী আলমারি খুলেছেন। বাবার জামা-কাপড়, চশমা। স্মৃতি, শুধু স্মৃতি। কাপড়ের ভাঁজের তলায় সেই ব্যাগটা। মেজর মুখার্জির ব্যাগ। যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রেখে দিয়েছেন। ব্যাগটা খুললেন। প্লাস্টিকের স্বচ্ছ পকেটে মা-কালীর ছবি, সামান্য সিঁদুর মাখানো। ভেতরে পাটে পাটে একশো টাকা, পঞ্চাশ টাকা, দশ টাকার নোট। আবার মুড়ে রাখলেন। কার টাকা, কে রাখে!

ওদিকে রুকু আর সুকু বসে আছে মেজর মুখার্জির ঘরে। সে-রাতে যেখানে যে জিনিস যেভাবে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলেন সব ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। পুলিস বলেছে কোনও জিনিসে হাত দেওয়া চলবে না।মেঝের ওপর ম্যাপটা সেই একই ভাবে বিছানো। তার ওপর লেনস, পাইপ, একটা পেনসিল। আফ্রিকার স্কেলিট্যান কোস্টের কাছে গোল একটা বৃত্ত।

দু' ভাই মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসে আছে। সুকু বললে, ''দেখ দাদা, আমাদের আর বড় হয়ে দরকার নেই। বড় হলেই মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, বুড়ো হলেই জীবনটা যেন কেমন হয়ে যায়! মা থাকে না, বাবা থাকে না, কেউ থাকে না। হঠাৎ একদিন মরে যায়। আয়, আমরা যেমন আছি, তেমনই থাকি।"

"ঠিক বলেছিস সুকু। কিন্তু আমরা যে কেবলই বড় হয়ে যাচ্ছি। লম্বা হয়ে যাচ্ছি।"

"কোনও ভাবে বড় হওয়াটা বন্ধ করতে হবে। কী করে করা যায় বল তো?"

"চল, ফাদারকে জিজ্ঞেস করে আসি। ফাদার সব জানেন।"

সুকুর কাঁধে রুকুর হাত। দু' ভাই বাগানের রাস্তা ধরে হাঁটছে। বাগানের শেষে বেড়া। বেড়ার পর ঢালু হয়ে জমিটা চার্চের পেছন দিকে নেমে গেছে। গির্জার চুড়োটা উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। রঙ-বেরঙের কাঁচ বসানো লম্বালম্বা জানালায়। ঝোপের পাশে সাদা দুটো খরগোশ।

পা পর্যন্ত সাদা পোশাক পরে ফাদার প্রেয়ার-রুমের দিকে যাচ্ছিলেন। দু' ভাই বিষণ্ণ মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"হ্যালো মাই সানস।"

"ফাদার, একটা প্রশ্ন।"

"বলো।"

"ফাদার, কেমন করে ছোটই থাকা যায়, আমরা আর বড় হতে চাই না।"

"হোয়াই, কেন তোমরা বড় হতে চাও না?"

"বড় হলেই মানুষের দুঃখ হয়, অসুখ হয়, মারা যায়, হারিয়ে যায়।"

"হুঁ। ঠিক। ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমাদের আমি যদি মৃত্যুকে জয় করার কৌশল শিখিয়ে দিই, দুঃখকে জয় করার কৌশল শিখিয়ে দিই? চলো আমার সঙ্গে।"

তিন জনে প্রেয়ার-রুমে এলেন। সামনেই ক্রুশবিদ্ধ যিশু। সারা মুখে স্বর্গের হাসি। "তোমরা ওই পুলপিটের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। মৃত্যু ওই মহামানবকে পরাজিত করতে পারেনি। বুদ্ধ, মহাবীর, তোমাদের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, এঁদের কাউকেই মৃত্যু কিছু করতে পারেনি। এঁরা বড় হতে হতে বড় হতে হতে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে বসে আছেন। তোমরাও তাই হও।"

একটা, দুটো, তিনটে বাতি জ্বলে উঠছে। দু' হাতে, দু পায়ে পেরেক মারা, মাথায় কাঁটার মুকুট, যিশু ক্রুশে ঝুলছেন, তবু মুখে অম্লান হাসি। বাতির আলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফাদার হেঁট হয়ে একের পর এক বাতি জেলে চলেছেন। একজন, দুজন করে সকলে সমবেত হতে শুরু করেছেন। হঠাৎ অরগ্যান বেজে উঠল। বিশাল হলের দেয়ালে দেয়ালে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সুর আছড়ে পড়ল।

ফাদার লকহার্ট ওককাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ঃ

Since you are God's dear children.
You must try to be like Him.
Your life must be controlled by love.
Just as Christ loved us and gave His life for us.
As a sweet-smelling offering and sacrifice
That pleases God. (সমাপ্ত)

ছবি দেবাশিস দেব

উইং থেকে গোল

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. কে.)

॥ ৭ ॥

বিপদের মতো, সাফল্যও বোধহয় একা আসে না। অল ইন্ডিয়া টাটা স্পোর্টস শেষ হল। বোম্বাই থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই জামশেদপুরে একটা অল ইন্ডিয়া ভলিবল টুর্নামেন্ট হল। টেলকোর হয়ে খেললাম। এবং তারপর ভলিবল খেলার একাধিক জায়গা থেকে চাকরির ডাক এল। ফুটবল, অ্যাথলেটিকস আর ভলিবল—তিনটেতেই তখন বেশ নাম হয়েছে। এছাড়া ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টনও খেলতাম। এই সময়ে একদিন বাবা সোজাসুজি বললেন, "দ্যাখো, সব করতে গেলে কিছুই করতে পারবে না। যে-কোনো একটা নিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। আমার মনে হয়, ফুটবলেই তুমি বেশি নাম করতে পারবে।"

প্রদীপ (১৯৫৩)

সত্যি কথা বলতে কী, অন্য খেলাধুলোয় অল্পবিস্তর জড়িয়ে থাকলেও, আমি নিজেও জানতাম ফুটবল-মাঠই আমার আসল জায়গা। বিহারের হয়ে সন্তোষ ট্রফির আসরে যাওয়ার আগেই বড় ফুটবলার হবার স্বপ্ন আমার মনের মধ্যে একটু-একটু করে দানা বেঁধেছিল। তোমাদের আগেই বলেছি, উনিশশো বাহান্নয় ষোলো বছর বয়সেই হিন্দুস্থান কেবলস-এর অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। অফিসের লেজার-খাতার একপাশে একদিন কী খেয়ালে যেন লিখে ফেলেছিলাম—"আই শ্যাল প্লে ফর ইন্ডিয়া ইন অলিম্পিক ফুটবল।" উনিশশো ছাপ্পান্নয় মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতের হয়ে খেলে আসার পর জামশেদপুরে ঐ পুরনো অফিসের সহকর্মীরা আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। একটা আশ্চর্য উপহার সেদিন পেয়েছিলাম। লেজার-খাতায় যেখানে আমি ঐ লাইনটা লিখেছিলাম সেই অংশটি কেটে বাঁধিয়ে আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। কে জানত, ষোলো বছর বয়সী এক কিশোরের কাঁচা স্বপ্ন মাত্র চার বছরের মধ্যেই সত্যে পরিণত হবে!

উনিশশো তিপ্পান্নতেই আর-একটু হলে কলকাতা মাঠে খেলে ফেলেছিলাম। ঘাটশিলার একটা টুর্নামেন্টে আমাদের বিপক্ষ দলে খেলেছিলেন রবি দাস এবং কলকাতার আরও কয়েকজন ফুটবলার। মুখে-মুখে আমার ভাল খেলার খবর কলকাতায় পৌঁছে গেল। তখন মরশুমের শেষের দিক, ইন্টার-স্টেট ক্লিয়ারেন্স সম্ভব নয়। তবু, হাওড়া ইউনিয়নের হেমন্ত দে জামশেদপুরে লোক পাঠালেন। চক্রবেড়িয়ায় দে-বাড়িতেই আমাকে তোলা হল। হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে কয়েকটা ম্যাচ খেলার জন্য তৈরি হতে-হতে একটা সেভেন-এ-সাইড ম্যাচও খেলে ফেললাম কসবায়। সেই ম্যাচে আমি সাত গোল করায়, হেমন্ত দে খুব খুশি হলেন। কিন্তু, কী করে যেন ময়দানে রটে গেল যে, আমি সন্তোষ ট্রফিতে বিহার টীমে ছিলাম। ফলে, বেআইনিভাবে হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে খেলার চেষ্টা ছেড়ে ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরতে হল।

কলকাতায় এক সপ্তাহ কিন্তু খুব ভাল

কেটেছিল। দে-বাড়ির সমবয়সীরা একদিনেই বন্ধু হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে বেড়ালাম, দু' একটা খেলাও দেখলাম। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এই ভেবে রোমাঞ্চিত হতাম যে, এই কলকাতা শহরেই এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন বেঙ্কটেশ, আমেদ খান, শৈলেন মান্না, রামন, সাত্তার— আমার স্বপ্নের মানুষেরা। কলকাতা ময়দানে ওঁদের খেলা কত লক্ষ মানুষকে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছে। ওঁদের মতো না হোক, ফুটবল খেলে কিছু আনন্দও কি কাউকে কখনো দিতে পারব না? পারব। পারতে হবে।

জামশেদপুরে ফেরার ব্যবস্থা হেমন্ত দে-ই করে দিলেন। ট্রেনে একেবারে জানালার ধারে জায়গা পেলাম। হাওড়া স্টেশন ছেড়ে ট্রেন যখন ছুটতে শুরু করল, হঠাৎ খুব কান্না পেল। ভাবলাম, প্রথমবার আই এফ এ শীল্ডে একদিন খেলে ফিরে গেছি। কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা লক্ষও করেননি। দ্বিতীয়বার আইন বাধা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর চোখের জল শুকিয়ে গেল। বরং একটা প্রচন্ড জেদ জাগল। খেলতে হবে, এই কলকাতাতেই দারুণভাবে খেলতে হবে। কয়েক মাস পরেই কলকাতায় বসছে সন্তোষ ট্রফির জমজমাট আসর। আমি কি বিহার টীমে থাকব না? নিশ্চয় থাকব। আমি কি প্রথম এগারোজনের দলে এবারেও থাকব না? অবশ্যই থাকব। আমি কি কলকাতার ফুটবল-রসিকদের খুশি করতে পারব না? পারব, নিশ্চয় পারব।

দেখতে-দেখতে সেই সুযোগ এসে গেল। বিহার মুখোমুখি হল খোদ বাংলার সঙ্গে। বিহারের রাইট উইঙ্গার সতেরো বছর বয়সী পি কে ব্যানার্জি। আর আমাকে অকেজো করার কাজ নিয়ে বাংলার লেফট ব্যাক হয়ে কে দাঁড়ালেন জানো? প্রায় কিংবদন্তীর নায়ক—শৈলেন মান্না।

(ক্রমশ)

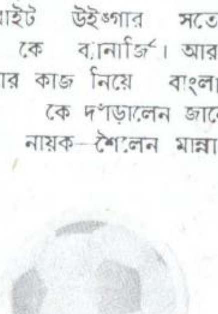

ছবির মজা

'আর' মার্কা ঘরগুলি রেড অর্থাৎ লাল, 'বি' মার্কা ঘরগুলি ব্লু অর্থাৎ নীল, 'জি' মার্কা ঘরগুলি গ্রীন অর্থাৎ সবুজ, এবং 'ওয়াই' মার্কা ঘরটি ইয়েলো অর্থাৎ হলুদ রঙে ভরাট করে যাকে পেলে, তাকে আকাশে উড়িয়ে দাও।

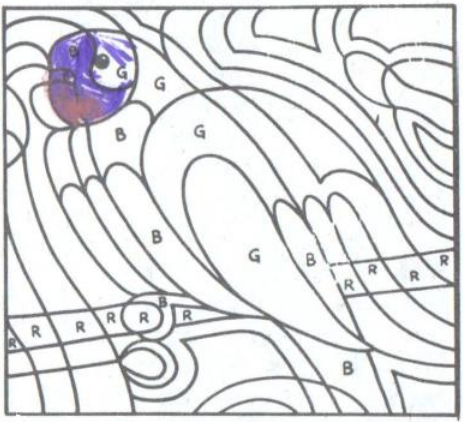

'বি' মার্কা ঘরগুলি ব্লু অর্থাৎ নীল, 'আর' মার্কা ঘরগুলি রেড অর্থাৎ লাল, এবং 'ওয়াই' মার্কা ঘরগুলি ইয়েলো অর্থাৎ হলুদ রঙে ভরাট করে দ্যাখো, ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

অভিমান

গৌরী সেন

বাবা, মা, ভাই—সবাই ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল তাতার। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বালব জ্বালানো ছিল, তার আবছা আলোয় সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল সে। আলনা থেকে নীল রঙের সোয়েটারটা নিয়ে গায়ে পরে খাটের তলা থেকে স্কুলের ব্যাগটা আর জুতো জোড়া বের করে নিল। ঘরের কোনা থেকে টুলটা এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে দরজার ছিট্‌কিনি খুলে পা টিপে-টিপে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

গেটের বাইরে এসে জুতো পরে এলোমেলো করে ফিতে বাঁধলো। নিজের হাতে তো কোনোদিন জুতোর ফিতে বাঁধেনি, স্কুলে যাবার সময়, কি কোথাও বেড়াতে যাবার সময় বাবাই বেঁধে দেন।

গলার কাছটা একটু ব্যথা-ব্যথা করে উঠল। আর চোখদুটোও একটু করকর করতে লাগল। ভাল করে ঢোঁক গিলে চোখদুটো মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বাড়িটার দিকে চোখ পড়ল। এত রাতে কখনও তো বাইরে থেকে বাড়িটা দেখেনি সে। রাস্তার আলোয় বাগানের গাছগুলোর ছায়া পড়েছে বাড়িটার দেয়ালে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে, ঠিক যেন মায়াপুরী। যাক গে, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? এ-বাড়ির মায়া তো চিরদিনের জন্যই কাটিয়ে যাচ্ছে সে।

রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েই বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। কী নির্জন! লাইট-পোস্টের ঝাপসা আলোয় অন্ধকার তো ভাল করে কাটেইনি, বরং আরও যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না, মনে সাহস আনতে হবে। জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চলল সে। একটু পরেই পেছন দিকে কার পায়ের আওয়াজ শুনে মুহূর্তের মধ্যেই শরীরটা যেন পাথর হয়ে গেল। এক পা চলারও আর শক্তি রইল না। ঠিক তখনই কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল কালটু। একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল।

"আরে তুই! আমি ভেবেছিলাম কে না কে।" হেসে হেসে বলল তাতার। কালটু লেজ নাড়তে-নাড়তে অবাক হয়ে তাতারের দিকে তাকাল। সামনের একটা লাইটপোস্টের আলোয় কালটুর চোখের দৃষ্টির অর্থ সহজেই বুঝে ফেলল তাতার। গম্ভীর ভাবে বলল, "এত রাতে কোথায় যাচ্ছি? তাই জিজ্ঞেস করছিস তো? স্টেশনে।"

মাথা উঁচু করে কালটু বলল, "কিঁউ?" আওয়াজটা ঠিক যেন কথার মতো শোনাল। উদাস সুরে তাতার বলল, "বাড়িতে কেউ আমায় ভালোবাসে না রে, তাই।"

কালটু খুব অবাক হয়ে তাতারের মুখের দিকে তাকাল।

তাতার বলল, "এই তো কাল সন্ধেবেলা, আমার ছোটমাসি, মেসো আর তিতলি এসেছিল আমাদের বাড়ি। বাইরের ঘরে

সবাই মিলে কত কী গল্প করছিল, ওদের হাসি, গল্প সবই আমি আমার পড়ার ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। মা রান্নাঘরে গিয়ে ডিমের ডেভিল ভাজছিলেন,, তার দারুণ গন্ধও আমার নাকে এসে ঢুকছিল, তবু আমি পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠিনি কারণ আমার পরীক্ষা চলছে তো! এ-সময় যে কারও সঙ্গে গল্প করতে নেই, তা কি আমি জানি না! কিন্তু তিত্‌লিটা হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমায় বলল, 'ও বড়দা, আমায় তাড়াতাড়ি ভাল করে লুকিয়ে রাখো তো! ছোড়দা যেন কিছুতেই খুঁজে না পায়।' একবার ভাবলাম, তিত্‌লিকে ঘর থেকে চলে যেতে বলি, কিন্তু তাতে ওর মন খারাপ হয়ে যেত না!

"আর এমন মিষ্টি দেখতে হয়েছে মেয়েটা যে, ওকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে, ওর সঙ্গে একটু খেলতে, কথা বলতে ইচ্ছে করে। তাই চেয়ার থেকে উঠে ওকে একটু আদর করে যেই না আলমারির পেছনে ওকে লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছি, ওমনি মা তিত্‌লিকে ডাকতে ডাকতে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। তারপর আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালেন না! আমি বললাম যে, 'আমি এইমাত্র পড়া ছেড়ে উঠেছি এক্ষুনি আবার বসব।' কিন্তু মা আমার কথায় কান না দিয়ে যাচ্ছেতাই করে বকতে লাগলেন। ভাইও তখন ঘরে ঢুকেছে। ছোট ভাই-বোনের সামনে মা আমায় বকতেই লাগলেন, বকতেই লাগলেন। এতে আমার মান থাকে! এর পর কি ওরা আমায় বড় ভাই বলে মানবে! আমার কোনো কথা কোনোদিন শুনবে ওরা!

"তারপর বাবা এসে মাকে তিতলিকে আর ভাইকে বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মাকে অবশ্য কিছুই বললেন না বাবা। কারণ, তিনি তো জানেন যে, ছোটদের সামনে বড়দের বকতে নেই!

"মা যখন বকছিলেন, তখন আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু যতক্ষণ সবাই ঘরে ছিল ততক্ষণ আমি কাঁদিনি, কিন্তু সবাই যখন ঘর থেকে চলে গেল তখন খুব কেঁদেছি, আর মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি যে ও বাড়িতে আর নয়।"

উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে লাগল তাতার। সহানুভূতির ভাব নিয়ে গুটগুট ক'রে পাশে পাশে চলতে লাগল কালটু।

তাতার বলল, "যে কোনো একটা ট্রেনে উঠে পড়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাব। যেখানে আমার কোনো মান-সম্মান নেই, সেখানে কি থাকা যায় তুই ই

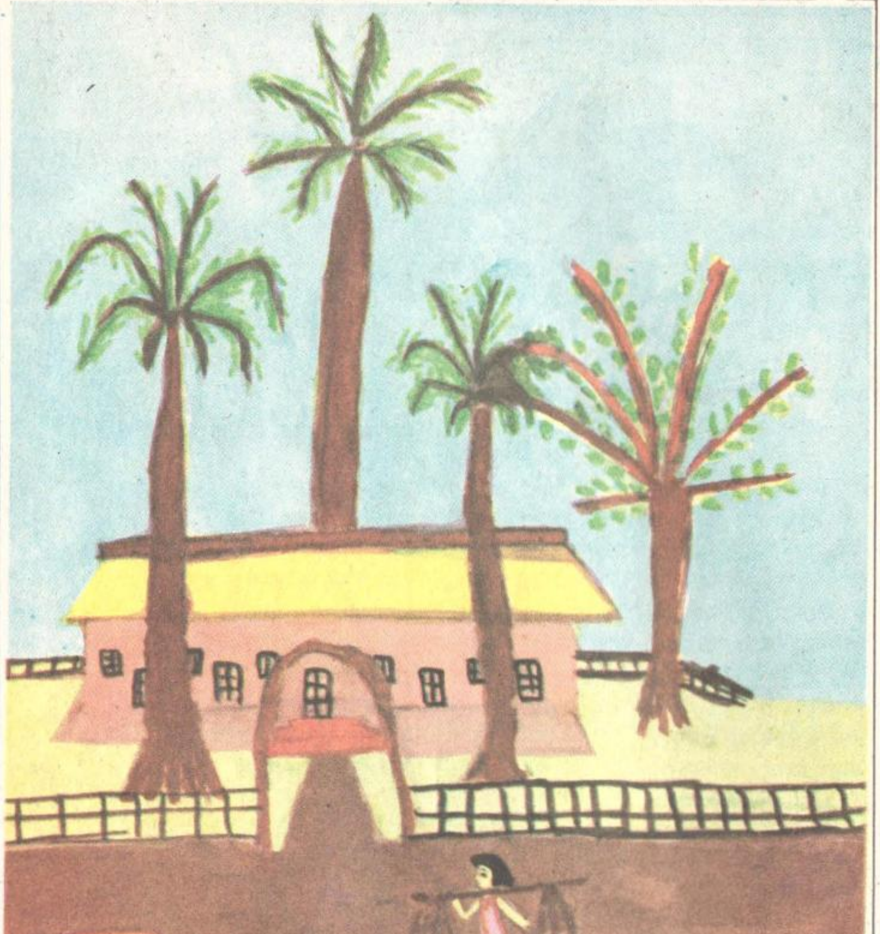

ছবি এঁকেছে মধুছন্দা ভাদুড়ী (বয়স ৮)

বাইরে যেওনা

শালিখ ডাকে কিচির-মিচির,
পায়রা ডাকে বকম-বকম
কুকুর ডাকে ঘেউ-ঘেউ—
তোমরা বাইরে যেও না কেউ'

সম্রাট ঘোষ (বয়স ৭)

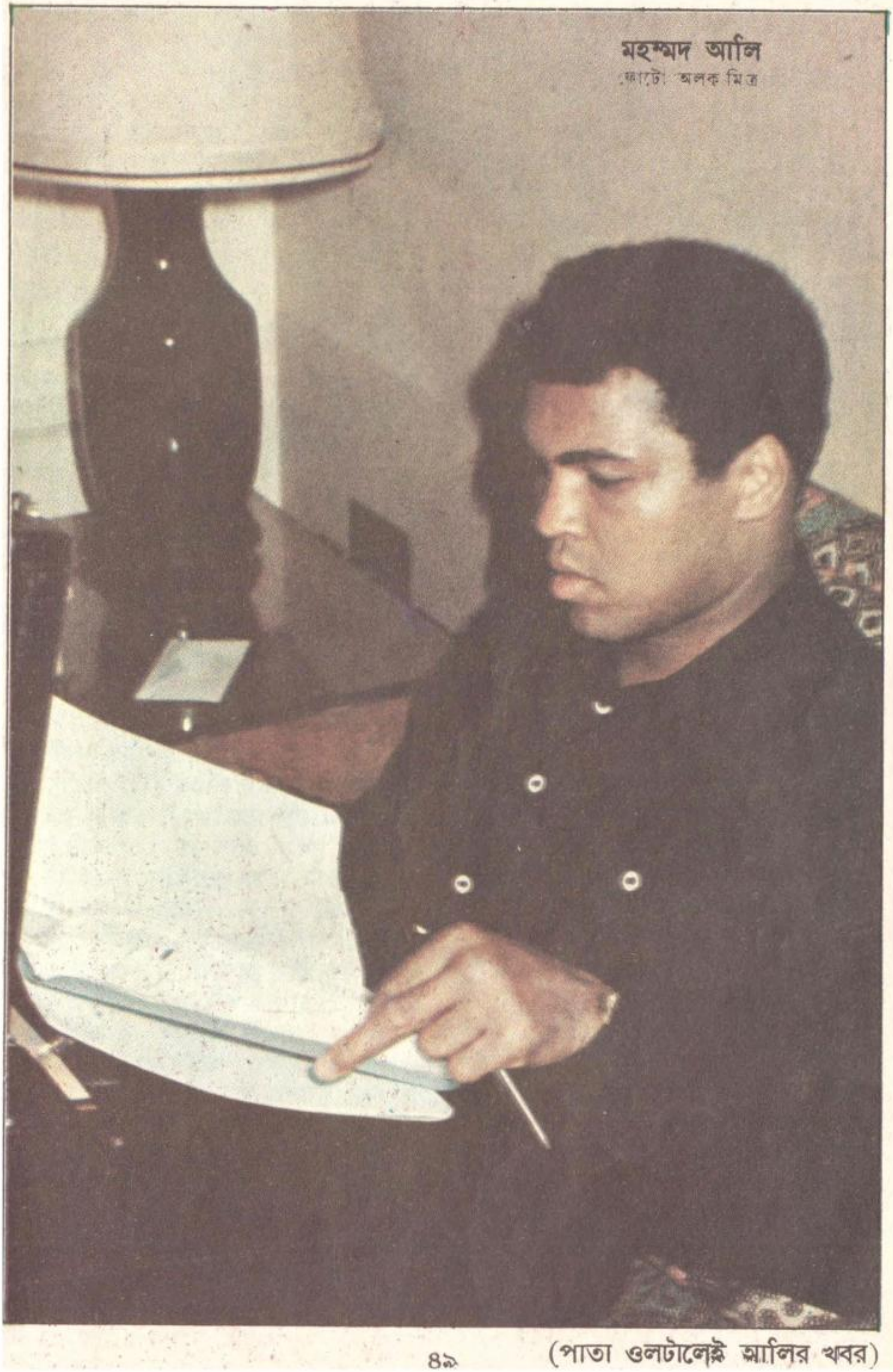

মহম্মদ আলি
ফোটো: অলক মিত্র

(পাতা ওলটালেই আলির খবর)

আলি হেরে গেলেন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

গত বিশ বছর ধরে বক্সিংয়ের জগৎটা যিনি প্রায় একাই মাতিয়ে রেখেছিলেন সেই আশ্চর্য হেভিওয়েট বক্সার এবং প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলি ২ অকটোবরের লড়াইতে ভীষণভাবে হেরে গেলেন। এবং হারলেন তাঁরই এক কালের স্পারিং পার্টনার এবং শিষ্য ল্যারি হোমসের কাছে। এ লড়াই জিতলে আলি একটা অবিশ্বাস্য নজির সৃষ্টি করতেন। পর-পর চারবার হেভিওয়েট বক্সিংয়ের বিশ্ব খেতাব জিতে নেওয়া। ইতিমধ্যেই তিনি তিনবার এই খেতাব পেয়েছেন, এবং সেখানেও তিনি অনন্য। আলিকে বাদ দিলে দুবার বিশ্ব খেতাব জয়ের গৌরব কেবল ফ্লয়েড প্যাটারসনের।

নিছক রেকর্ডের নিক্তিতেও আলি বক্সিংয়ের ইতিহাসে একজন ব্যাখ্যাতীত মানুষ। সেই ১৯৬৪ সনে সোনি লিসটনকে হারিয়ে আলি (তখন ক্যাসিয়াস ক্লে) দুনিয়াময় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন এই সেদিন অবধি তিনি সেই বিতর্ক এবং উত্তেজনাকে যেন তেন প্রকারেণ জিইয়ে রেখে-ছিলেন। আঠারো বছর ধরে বক্সিংয়ের ওই রক্তক্ষয়ী ক্রীড়াঙ্গনে পয়লা নম্বর লড়িয়ে হয়ে টিকে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। আমরা রিংয়ের মধ্যে লড়াইয়ের সময়ে যে রক্তপাত এবং প্রত্যক্ষ আঘাত দেখতে পাই তার চেয়েও গভীর ক্ষত এবং ক্ষতি ঘটে যায় বক্সারের শরীর এবং মস্তিষ্কে। স্রেফ রিংয়ের মধ্যে তো বক্সারের মৃত্যু এতাবৎ কম হয়নি। অনেক বড় বড় বক্সারই অকালে অবসর নিয়েছেন এই পরিণতির আশঙ্কায়। অথচ সমস্ত গৌরব, মর্যাদা এবং স্বীকৃতি পাওয়ার পরও আলি বার-বার অবসর-জীবন থেকে ফিরে এসেছেন লড়াইয়ের আখড়ায়। সে কি শুধুই অর্থের টানে?

ল্যারি হোমসের সঙ্গে লড়াইয়ের আগে আলির স্ত্রী, তাঁর ডাক্তার, তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুমহল তাঁকে বারণ করেছিলেন বক্সিংয়ে ফিরে যেতে। তাঁর বয়স এখন ৩৮, তাঁর শরীর আর আগের মতন পটু নেই, মেদ জমেছে তাঁর দেহে, তিনি পেশাদারি লড়াই করেননি প্রায় দু' বছর। তাঁর গতি আগের চেয়ে মন্থর, তাঁর কথার ভঙ্গিও আগের চেয়ে অনেকখানি জড়িয়ে গেছে। এবং লড়াইয়ে জেতার সেই উদগ্র বাসনাও আজ অনেকখানি স্তিমিত। সকলেরই প্রায় আশঙ্কা ছিল আলি হেরে যাবেন। ফ্লয়েড প্যাটারসন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, এর আগে আলি অনেক অসাধারণ কীর্তি দেখিয়ে আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। কিন্তু এবার সে চেষ্টা করছে একে-বারে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে।

আলি সেই অসম্ভব কাজটা করে দেখাতে পারলেন না। এতে কি তাঁর খুবই মানহানি হল? তাঁর প্রবাদতুল্য জীবন কি এর দরুন ছারখার হয়ে গেল? না। জীবনের সব কিছুর কি জয়লাভ দিয়েই প্রমাণ করা যায়? একজন বীর তাঁর মৃত্যু দিয়েও প্রমাণ করতে পারেন তিনি বীর। এই বয়সে, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে আলি তাঁর কিংবদন্তীর জীবনকে অনেকখানি গৌরবান্বিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন তিনি কারো ঘুঁষিকে ভয় পান না। তিনি দেখিয়েছেন একেবারে পরাস্ত হলেও তিনি ছিন্নভিন্ন হন না। দশ-দশটা রাউণ্ডের একটাও তিনি জেতেননি, অথচ শেষ অবধি দুই পায়ে খাড়া ছিলেন। হোমসের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা এর সিকি-ভাগ মার হজম করতে পারত কি না সন্দেহ। বড় কথা, আলি হেরে গিয়ে কোনও অজু-হাতও দেননি। কারণ বীরেরা তা করেন না।

অবসর জীবন থেকে ফিরে এসে লড়াইয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন বক্সিংয়ের অপর প্রবাদপুরুষ জো লুইও। প্রথমে এজার্ড চার্লস, পরে রকি মার্সিয়ানো তাঁকে তুলো-ধুনো করলেন। কিন্তু তাতে কি জো লুইয়ের ষোল বছরের চমকপ্রদ বক্সিং-জীবনের আসল মুহূর্তগুলো মিথ্যে হয়ে গেল? না, তা হয় না। আলির ক্ষেত্রেও তাই। আলির বক্সিং বলতে আমরা বুঝি সোনি লিসটনের সঙ্গে তাঁর অবিশ্বাস্য দুটি লড়াই, যার দ্বিতীয়টি শেষ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। আলির লড়াই বলতে বুঝি ম্যানিলাতে জো ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় শ্বাস-রুদ্ধ-করা লড়াই। সে লড়াইয়ের নবম রাউণ্ডে আলির ধারণা হয়েছিল তিনি

হেরে যাবেন। তারপর নিজেই নিজেকে বোঝালেন একজন চ্যাম্পিয়ন কখনও রণে ভঙ্গ দেয় না। তিনি না চ্যাম্পিয়ন? এরপর যে সিংহের লড়াই লড়ে তিনি চোদ্দ রাউন্ডে থামিয়ে দেন ফ্রেজিয়ারকে তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। আলিকে মনে পড়বে জাইরে শহরের সেই লড়াইয়ের জন্য যেখানে তাঁর বিখ্যাত রোপ-এ-ডোপের চাতুরি এবং ঘুষির অনবদ্য কম্বিনেশনে তিনি অষ্টম রাউন্ডে মাটিতে চিত করে দেন ভয়ঙ্কর জর্জ ফোরম্যানকে। আলিকে মনে পড়বে তাঁর বিখ্যাত পরাজয় কেন নর্টনের সঙ্গে লড়াইয়ে। সপ্তম রাউন্ডে নর্টনের আঘাতে তাঁর চোয়াল ভেঙে গেল, কিন্তু তিনি লড়াইয়ের শেষ অবধি লড়ে গেলেন। এই শতকের শ্রেষ্ঠ বক্সিংয়ের নমুনা এগুলোই। এই লড়াই দিয়েই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আলির প্রবাদ।

শতাব্দীর অন্যতম সেরা বক্সার ছাড়াও আলি আরও অনেক কিছু। তিনি একটি অসাধারণ, চিত্তাকর্ষক লড়াইয়ের ঢঙের প্রতিনিধি। যে ঢঙ তিনি নিজেই অন্তত দশ বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন। প্রজাপতির মতন নেচে নেচে, উড়ে উড়ে, ভ্রমরের হুল তিনি ফুটিয়ে দিতেন এক-একটা বিদ্যুতের মতন ত্বরিত হুক কাট বা পানচে। লড়াইয়ের অনেকটা সময়েই তিনি তাঁর মুখ গার্ড করে থাকতেন না। যেন চাইলেই চোয়ালে ঘা কষিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু না, হরিণের মতন আলি চরে বেড়াতেন রিংময়। তাঁকে স্পর্শ করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তারপর সুযোগ বুঝে আলি যখন কারও মুখ, মাথা কিংবা দেহে ঘুষি ছুড়তেন তা বাস্তবিকই ছিল বক্সিংয়ের কেতাবি চালের ছাঁকা-ছাঁকা মার। হেভিওয়েট বক্সিংয়ে আলি পারতপক্ষে লাইটওয়েট বক্সিংয়ের চালচলন আমদানি করেছিলেন। যাঁরা হেভিওয়েট বক্সিং বলতে দুটো মস্ত ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি বুঝতেন তাঁরা হকচকিয়ে গেলেন এই স্টাইলের খেলা দেখে। আশঙ্কা হয় আলির সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো এই অনিন্দ্যসুন্দর স্টাইল রিং ছেড়ে চলে যাবে।

বাক্যবাগীশ আলি তাঁর অনেকখানি লড়াই লড়তেন রিংয়ের বাইরেই। প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে মজার মজার ছড়া কাটতেন। কখনও-কখনও বলে দিতেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাউন্ডে সাবাড় হবে। আসল লড়াইয়ের পূর্বরাগ হিসেবে এই ঠাট্টার লড়াইও কিছু কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। এবং এইভাবেই বক্সিংকে আলি একটা ভয়ংকর জ্যান্ত ক্রীড়ায় পরিণত করেছিলেন। রসিকরা বললেন, বক্সিংয়ের জীবনে আলিই সব চেয়ে বড় ঘটনা।

এক সময় আলি বক্সিং পেরিয়ে কালো মানুষের দাবির লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মুসলমান ধর্মের জন্যও আলির অবদান বড় কম নয়। সেই স্বীকৃতিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সম্মানীয় নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের দূত হিসেবে আলি সফর করেছেন আফ্রিকায়। তাঁকে পরম সৌজন্যে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রুশ নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ। তাঁর জীবনকালেই তাঁকে নিয়ে গান এবং সিনেমা হয়েছে। এবং আলি নিজেও তাঁর জীবন নিয়ে এই কিংবদন্তী রচনায় যোগ দিয়েছেন এক দুর্দান্ত আত্মজীবনী লিখে—'দি গ্রেটেস্ট, মাই ওন স্টোরি'।

আলির জীবনে প্রাপ্তির শেষ নেই। বাকি ছিল ক' ফোঁটা অশ্রু মাত্র। ২ অকটোবরের ওই পরাজয়ের সঙ্গে যে চোখের জল মিশল তাতে আলির কাহিনী তার সম্পূর্ণ চেহারা পেল। তাঁর জীবন এবং তাঁর প্রবাদ ওইভাবে আরও মজবুত, আরও মর্মস্পর্শী হল। আলির পরাজয়ে আমরা যখন অন্তরে ব্যথা পাই সেই ব্যথাই আমাদের আরও নিকটে নিয়ে যায় এই অমলিন নায়কের।

ধবধবে
সাদা
ডেট'র
সাদা
নতুন ফর্মূলা
ডেট
ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার
পাউডার
অতুলনীয় ধোয়ার শক্তি, অফুরন্ত ফেনা,
সতেজ সুগন্ধ আর ধবধবে সাদা!

আবার গাভাসকার

অভিমন্যু

এগারোই অক্টোবর। বোম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফিসে মিলিত হলেন পলি উমরিগড়, দাত্তু ফাদকাড়, এম এল জয়সীমা, বিজয় মেহেরা ও চান্দু সারভাতে। এবং মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে কাজটা সারলেন। ঘোষণা করা হল সামনের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব করবেন বোম্বাইয়ের সুনীল মনোহর গাভাসকার।

অধিনায়ক পদে গাভাসকারের ফিরে আসা নিঃসন্দেহে প্রত্যাশিত ঘটনা, এবং আমার মনে হয় এতে প্রায় সকলেই খুশি হয়েছেন। নিন্দুকেরা বলেন দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে গাভাসকার হঠাৎ-হঠাৎ অনিচ্ছা প্রকাশ করে বসেন; তবু এটা মানতেই হবে, এই মুহূর্তে গাভাসকারই যোগ্যতম ব্যক্তি।

কেমন অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার? আঠারোটি টেস্টের মধ্যে ছয়টিতে জিতেছেন, একটাতেও হারেননি, অতএব তিনি মোটা-মুটি সফল। আসিফ ইকবাল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ জয়ের পিছনে যে কয়েকটি কারণ দেখিয়েছিলেন তার একটি ছিল গাভাসকারের সার্থক নেতৃত্ব। ক্রিকেট-বোদ্ধারা মনে করেন শুরুতে গাভাসকার সাধারণ মানের অধিনায়ক ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি অনেক পরিণত এবং বিচক্ষণ।

একজন সার্থক অধিনায়কের যেসব গুণের প্রয়োজন, গাভাসকারের মধ্যে তার কোনোটার অভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। ভারতীয় দলের তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। দলের অন্যান্য খেলো-য়াড়রা তাঁর ব্যাটিংয়ের উপর যে বিরাট আস্থা রাখেন তাতে গাভাসকার কখনও ফাটল ধরাননি। অনেকেই বলাবলি করছেন, ইংল্যান্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর ইয়ান বথাম মোটেই সুবিধা করতে পারছেন না। গাভাসকারের বিরুদ্ধে সে-রকম কোনো যুক্তি খাটে না। বরং অধিনায়ক থাকাকালীন বেশ কয়েকবারই তিনি চমৎকার ব্যাট করেছেন।

সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে গাভাসকার সবসময়ে সহ-খেলোয়াড়দের সাহায্য করতে চেষ্টা করেন, তাঁদের অনুপ্রেরণা দেন বুঝিয়ে বলেন কোথায় ভুল হচ্ছে, কী করা উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, গাভাসকার একজন লড়িয়ে খেলোয়াড়। উনি পরাজয়কে ঘৃণা করেন, এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়ের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে পিছপা হন না।

অধিনায়ক হিসেবে গাভাসকারের এই প্রথম বিদেশ সফর। অবশ্য ১৯৭৬ সালে অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেদী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ভারত সেবার জিতেছিল, কিন্তু এবার গ্রেগ চ্যাপেলের অস্ট্রেলিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী দল, নিউজিল্যান্ডও কম যায় না। এই অবস্থায় বিদেশের মাটিতে গাভাসকার কতটা সার্থক হন, তা দেখার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছি।

লম্বা খেলোয়াড়ের সুবিধে

চিরঞ্জীব

ভলিবলে এবং বাস্কেটবলে যে খেলোয়াড়দের উচ্চতা বেশি, তাঁদের সুবিধে অনেক। বিহারের দুই বাস্কেটবল খেলোয়াড় শ্রীবাস্তব ও সুনীল পান্ডা খুব কুশলী খেলোয়াড় না হয়েও উচ্চতার সাহায্যে টপ-স্কোরার হন। কয়েক বছর আগে রুশ বাস্কেটবল দল কলকাতায় এলে দেখেছিলাম. হাইট, ফিটনেস এবং স্কিলের সাহায্যে কীভাবে ও'রা ভারতকে হারিয়েছিলেন। এবার ঘুরে গেলেন মস্কোর ডায়নামো ভলিবল দল। নেতাজী স্টেডিয়ামে ও'রা তখন বল নিয়ে নামেননি। আগের রাত্রে কলকাতা এয়ারপোর্টে ও'রা নামতেই দেখি শহীদ মিনার দেখার মতো উপরের দিকে তাকিয়ে ও'দের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। কারও উচ্চতাই সাড়ে ছ' ফুটের কম নয়। সাত ফুটের উপরেও কয়েকজন আছেন।

পরদিন দর্শকপূর্ণ নেতাজী স্টেডিয়ামে ৮৫ মিনিটে ডায়নামো দল ১৫—১০, ১৫—১০, ১১—১৫ ১৫—৫ পয়েন্টে ভারতকে হারায়। শেষ সেটে খেলা হয়েছিল তেরো মিনিট এবং এক সময় মস্কোর দল ভারত-শ্রেষ্ঠ এই দলকে ১২—০ পিছিয়ে রেখেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় প্রতিযোগিতায় যাঁদের স্থান তৃতীয় তাঁরা ভারতের বিভিন্ন শহরে মোট ছটি ম্যাচের চারটিতে আমাদের জাতীয় দলকে হারালেন। বলা বাহুল্য এই ডায়নামো ও'দের দেশে তৃতীয় হলেও মূল দলের অর্ধেক খেলোয়াড়ও এই সফরে আসেননি।

এসব দিক থেকে ভারতীয় দল অনেক অভিজ্ঞ। উচ্চতায় আমাদের কয়েকজন ও'দের কাছাকাছিও ছিলেন। কম কুশলীও নন। বিশেষত আমাদের অধিনায়ক বলবন্ত সিং, সুরেশ মিশ্রের স্ম্যাশ বিপক্ষকে বারে বারে

পথ চলতে সর্বনাশ

হ্যাঁ কলকাতার রাস্তায় চলাফেরার কথাই বলছি।

তোমরা তো জান রাস্তায় কি রকম ভিড়, কত গাড়ী ঘোড়া, চলাফেরায় কত অসুবিধা এই কলকাতা শহরে। দিনের বেলায় ৪৫ লক্ষ লোকের মত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আসছে। দেড় লক্ষের মত গাড়ী ঘোড়া চলছে। আরও আছে, হাজার হাজার রিক্সা ঠেলাগাড়ী ইত্যাদি।

এরই মধ্যে পথ করে তোমাদেরও তো চলাফেরা করতে হয়। কাজেই বলছিলাম সব সময় একটু সাবধানে চলাফেরা করবে। ডানদিক বাঁদিক আবার ডানদিক না দেখে কখনও রাস্তা পার হবে না। দরকার মত তেমন বিপদে পড়লে বড়দের সাহায্য নিও। কিন্তু কখনও ঝুঁকি নিওনা।

কারণ কি জান? তোমরা তো এখনও ছোট। একদিকে তোমাদেরই বিপদ বেশী। আর অন্য দিকে তোমরাই হচ্ছ দেশের ভবিষ্যত। বড় হয়ে তোমরাই তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে, দেশের উপকার করবে আর দেশের সুনামও বাড়াবে।

সেইজন্য বলছিলাম সাবধানে চলাফেরা করবে। আর যদি অক্ষম দুর্বল এবং বৃদ্ধদের সাহায্য করতে পার, তাহলে তো খুবই ভাল।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

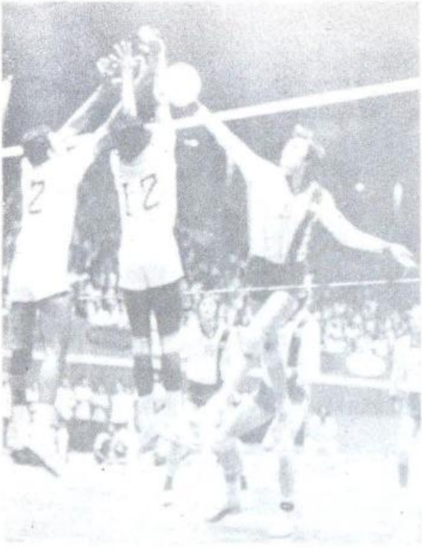

পরাস্ত করে। তবে আধুনিক ভলিবলের স্ম্যাশে টেনিসের মতো স্পিনের প্রাধান্য এসে গেছে। ভলিবলের পরিভাষায় একে বলা হয় স্লাইসড স্ম্যাশ। আমরা এ-ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে। ডায়নামোর অধিনায়ক গ্যার্গেলিয়ক, সারগেই, কুলেশভ, পাপলভ কার কথা বলব! প্রত্যেকেই দারুণ খেলেন। খেলায় ফিটনেস, স্ট্যামিনা বড় সম্পদ। কম বয়সীদের সাধারণত এসব গুণ থাকে। ভারতীয় দলের ও'রা অভিজ্ঞ হলেও ওই দুটিতে কিন্তু হেরেছেন। 'অর্জুন' পুরস্কার প্রাপ্ত বলবন্তকে তাই ক্ষণে ক্ষণে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের দলের গড় বয়স ২৯ বছর। ১৯৮২-র এশিয়ান গেমসের সময় এ'রা একত্রিশে পড়বেন। কিন্তু খেলবেন এ'রাই। আর এবার মস্কো অলিম্পিকে যে সোভিয়েট দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৯৮৪তে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে তাঁদের মধ্যে কে কে থাকবেন তা বিবেচনাধীন। ও'রা ১৯৮৪ সালের জন্য দল ঢেলে সাজাতে ডায়নামোর মতো একুশ বছর বয়সী কয়েকজন খেলোয়াড় বেছেছেন। ডায়নামোর চীফ কোচ সোলোদুহোফ বললেন, মন্ট্রিয়ল অলিম্পিকে চারজন এবারের অলিম্পিকস দলে নির্বাচিত হতে পারেননি। সরাসরি না হলেও পরোক্ষে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বয়স বাড়লে শক্তিও কমে।

জানি না, আমাদের খেলোয়াড় ও ক্রীড়া-কর্তাদের এই ধারণাটা কবে হবে!

উইলস ট্রফি

অলোক দাশগুপ্ত

অক্টোবরের গোড়ায় উত্তরাঞ্চলের চার প্রধান শহর দিল্লি, চন্ডীগড়, শ্রীনগর এবং জলন্ধরে বসেছিল তৃতীয় উইল্‌স ট্রফির আসর। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফিজি দ্বীপপুঞ্জ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি, নির্বাচকরা সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখছেন। সামনের সফরে ভারতীয় দলকে বেশ কয়েকটি সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলতে হবে। এই সব কারণ এবারের উইলস ট্রফির আকর্ষণ অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রথম তিনটি খেলায় উইলস একাদশ বাংলাকে, বোম্বাই রাজস্থানকে এবং বোর্ড সভাপতির একাদশ হায়দরাবাদকে অনায়াসে হারালেও, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল বেশ জমে উঠেছিল। খেলা শেষে দর্শকরা খুশি মনে বাড়ি ফিরেছেন।

পয়লা অক্টোবর চন্ডীগড়ের স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা উইলস একাদশ এবং বাংলার মধ্যে খেলাটি দেখতে পারে। আমরা যখন মাঠে ঢুকেছি, দেখলাম, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও স্কুল ইউনিফর্ম পরে লাইন দিয়ে মাঠে ঢুকছে। খেলোয়াড়রা যখন মাঠে নামলেন ওরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু, খেলা দেখে ওরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর এর জন্য দায়ী বাংলার খেলোয়াড়দের চরম ব্যর্থতা। ওঁদের বোলিং, ব্যাটিং এবং বিশেষ করে ফীল্ডিং দেখে মনে হয়েছিল, ও'রা "গলির ক্রিকেট" খেলছেন।

ঝড় এবং বৃষ্টি এসে শেষ পর্যন্ত খেলাটিকে বানচাল করে দেওয়ায় উইল্‌স একাদশ রানের গড়পড়তায় ম্যাচটি জেতে। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র ২৬ বল বাকি ছিল। বাংলার জয়ের জন্যে দরকার ১৪৪ রান এবং শেষ জুটি ব্যাট করছিল। বাংলা ঐ ম্যাচ নির্ঘাত হারত। উইল্‌স দলের পক্ষে বড় রান অংশুমান গাইকোয়াড (১১১ নট আউট) এবং যশপাল শর্মার (৭৪)।

মাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ

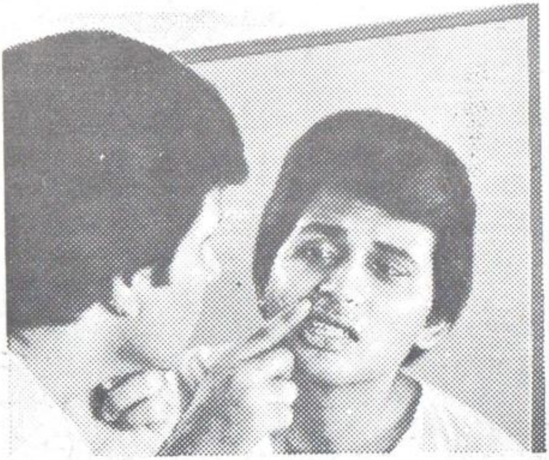

প্লেক (Plaque)
প্লেক হল জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, প্লেক দন্তমলে পরিণত হয়।

দন্তমল
দন্তমল দাঁতের গোড়ায় জমে, ফলে মাড়ি জ্বালা করে আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর হাড় ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত সাফ করবার সময় দুর্বল আর ফোলাফাঁপা মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে ব্যথা না পেলেও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তারের তৈরী ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট দিয়ে আপনার মাড়ির যত্ন নিন

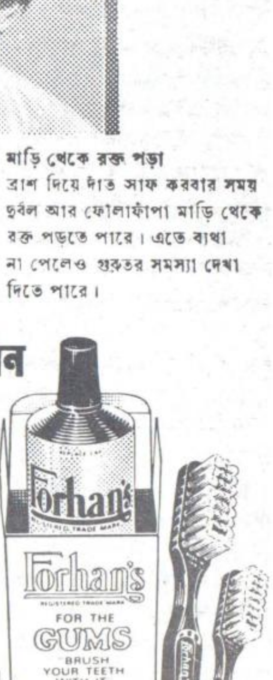

ডাঃ ফরহ্যান্সের অদ্বিতীয় ফরমুলা

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেণ্ট ক্রিয়ার ফরমুলা আপনার মাড়ির ওপরের ভাগ মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

মাড়ির গোলমাল হলে এমনকি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। রোজ রাত্রে আর সকালে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

বিনামূল্যে! "আপনার দাঁত ও মাড়ি যত্ন"
তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। ৩০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন:
ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসারী ব্যুরো,
পোস্ট ব্যাগ নং ১১৪৬৩, ডিপার্টমেণ্ট P 195- 224,
বম্বে ৪০০ ০২০।
যে ভাষায় চান জানাবেন।

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

224F-172 BN

Regd. T.M. Geoffrey Manners & Co. Ltd.

৩ (অক্টোবর জলন্ধরে উইলস একাদশ এবং বোম্বাই এবং দিল্লিতে বোর্ড সভাপতির দলের সঙ্গে দিল্লির খেলাটি প্রায় নাটকীয়-ভাবে শেষ হয়। প্রধানত গাইকোয়াড়ের ৮৭, যশপালের ৩১ এবং কপিলদেবের মারমুখী ৫৩ নট আউটের দৌলতে উইলস দল পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেটে ২৫৯ রান করে। বেঙ্গসরকার (৫৮), সন্দীপ পাতিল (৬৪) এবং গাভাসকার (৩৭) ভাল ব্যাট করলেও বোম্বাই পনের রানের জন্য ম্যাচ হেরে যায়।

ক্রিকেট যে কতটা নাটকীয় হতে পারে ফিরোজ শা কোটলার সেমি ফাইনাল ম্যাচটি না দেখলে বোঝা যেত না। খেলায় কখনও মনে হয়েছে দিল্লি জিতবে, কখনও মনে হয়েছে বোর্ড সভাপতির দল। দিল্লি টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। চেতন চৌহানকে এমন আক্রমণাত্মক মেজাজে এর আগে কখনও দেখিনি। তাঁর ৯০ এবং মহিন্দর অমরনাথ (৩২), সুরিন্দার অমরনাথ (৪২ নট আউট) এবং কীর্তি আজাদ (২৯) দিল্লি দলের রান চার উইকেটের বিনিময়ে ২২২-এ নিয়ে যান।

বোর্ড সভাপতির দলও পালটা জবাব দেয় বিশ্বনাথ (৪৮), সঞ্জীব রাও (৪০), শ্রীনিবাসন (২৬) এবং ব্রিজেশ প্যাটেলের মাধ্যমে। কিন্তু আসল নাটক অপেক্ষা করছিল শেষ দুই ওভারে। মাত্র সাত বল বাকি, বোর্ড দলের জয়ের জন্য দরকার ১৪ রান। ফীল্ডসম্যানরা সকলে বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় অধিনায়ক মহীন্দার অমরনাথ নো-বল করলেন এবং দুর্ভাগ্যবশত বলটা উইকেটে লেগে বাউন্ডারি সীমানা পেরিয়ে গেল—চার রান এবং আর একটা অতিরিক্ত বল, নরিন্দার পাল সিং তা থেকে দুই রান নিলেন।

শেষ ওভারে দরকার আট রান। পরমজিৎ প্রথম বলেই এক রান পেলেন। নরিন্দার এরপর সুনীল ভালসনের তৃতীয় এবং পঞ্চম বলে দুটি অসাধারণ চার মেরে বোর্ড সভাপতি দলকে জিতিয়ে দিলেন। দিল্লির হয়ে দারুণ বল করেছেন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় বিষেণ সিং বেদী।

৫ অক্টোবরের ফাইনালও হয়েছে দারুণ জমজমাটি, টসে জিতে উইলস অধিনায়ক কপিলদেব সভাপতির একাদশকে প্রথমে

অশোক মালহোত্রা

ব্যাট করতে দেন। সঠিক সিদ্ধান্ত, কারণ সহজ উইকেটে বিপক্ষ দলের রান তাড়া করাই সুবিধাজনক। সঞ্জীব রাও (৫১), শ্রীকান্ত (৪৮) এবং শ্রীনিবাসন (৪০) বড় ইনিংসের ভিত গড়লেও পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় বোর্ড সভাপতি একাদশ তাদের পঞ্চাশ ওভারে ২১৬ রান করে আট উইকেটের বিনিময়ে। উইলস দলের তরুণ অফ-স্পিনার গোপাল শর্মার বোলিং প্রশংসার দাবি রাখে, যজুর্বিন্দ্রসিং (৫০), যশপাল (৫৩) এবং অশোক মালহোত্রা (৬৯ নট আউট) আস্তে আস্তে উইলস একাদশকে জয়ের পথে নিয়ে যান। কিরমানি দুটি অসাধারণ ক্যাচ লুফে একসময়ে সভাপতি দলের জয়ের আশা জিইয়ে তুলেছিলেন।

তবে সেমি-ফাইনালের মতোই ফাইনালেও... উত্তেজনা তোলা ছিল শেষ ওভারের জন্য। যোগরাজ সিংয়ের তৃতীয় বলটিকে পুল করে মিড-উইকেট বাউন্ডারির উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে উইলস দলের তিন-উইকেট জয় এনে দিলেন "উত্তরের বিশ্বনাথ" নামে খ্যাত হরিয়ানার উঠতি ব্যাটসম্যান অশোক মালহোত্রা।

ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

ছোটদের যত সেরা বই

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা-সিরিজের উপন্যাসে অদ্বিতীয়, প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানার বর্ণনায় তুলনাহীন, এ যেমন সত্যি, তেমনই তাঁর 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসটি যে এক অসাধারণ কীর্তি এতেও কোনো সন্দেহ নেই। ছোট্ট একটি বছর বারোর ছেলে, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সারা দেহে তার জখমের চিহ্ন। জ্ঞান ফিরল একসময়ে, কিন্তু স্মৃতি ফিরল না। নিজেই একটা নাম বানিয়ে নিল সে—ফটিকচাঁদ পাল। সেই স্মৃতিভ্রষ্ট ছেলেটির স্মৃতি হারানো এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী 'ফটিকচাঁদ।' প্রচ্ছদ ও ইলাসট্রেশন—সত্যজিৎ রায়েরই।

বিমল মিত্র একটি চমক-জাগানো রূপকথা-কাহিনী লিখেছেন তোমাদের জন্য। সে-কাহিনীর নাম — 'রাজা হওয়ার ঝকমারি।' বোম্বাগড়ের রাজা একটা অদ্ভুত শর্ত রাখলেন দুই ছেলের সামনে। বললেন যে, মাত্র ছ' মাসের মধ্যে যে-ছেলে পৃথিবীর সব-থেকে বোকা লোকটিকে খুঁজে আনতে পারবে, তাকেই তিনি তাঁর সিংহাসনে বসাবেন। এই শুনে দুই ছেলে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ল বিশ্ববোকাকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু খুঁজে বার করা কি মুখের কথা? সে যে কী ঝকমারি ব্যাপার—তাই নিয়েই গল্পের রাজা বিমল মিত্র লিখেছেন এই দারুণ উপভোগ্য উপন্যাস।

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-উপন্যাস : বাদশাহী আংটি ৬ গ্যাংটকে গন্ডগোল ৬ সোনার কেল্লা ৬ বাক্স-রহস্য ৬ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৬ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৬ জয়বাবা ফেলুনাথ ৬ ফেলুদা এন্ড কোং ১০ গোরস্থানে সাবধান ৮ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৬ সত্যি রাজপুত্র ৬ তিন নম্বর চোখ ৬ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬ সবুজ দ্বীপের রাজা ৫ ডুংগা ৭ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৬ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬ সমগ্র কিশোর সাহিত্য (১ম) ২০ **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** আগ্রা যখন টলমল ৫ যাঁর নাম ঘনাদা ৬ ঘনাদার ফুঁ ৬ তেল দেবেন ঘনাদা ৬ **শৈলেন ঘোষের** অরুণ বরুণ কিরণ-মালা ৪ মিতুল নামে পুতুলটি ৫ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬ বাজনা ৬ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬ আমার নাম টায়রা ৫ আজব বাঘের আজগুবি ৭ **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের** ভয়ের মুখোশ ৬ পাথরের চোখ ৬ সীমানা ছাড়িয়ে ৬ পাঁচ মুন্ডির আসর ৭ **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ভূমিকম্পের পটভূমি ৪ **ইন্দ্রমিত্রের** বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কান্ডকারখানা ৭ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫৫। **শঙ্করীপ্রসাদ বসুর** আমাদের নিবেদিতা ৬ **গিরিধারী কুণ্ডুর** টংসা চু ৫ **বিমল মিত্রের** রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮ **শিশিরকুমার মজুমদারের** তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৫ **রেবন্ত গোস্বামীর** অরুমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্পো ১২ আরো এক ডজন ১০ ফটিকচাঁদ ৮ **শিবরাম চক্রবর্তীর** হর্ষবর্ধর নিত্যনূতন ৪ শিব্রামের বারো আড়ি ৫ দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ ক্রিস্ট্যাল ১০ **সমরজিৎ করের** একটি সংকেতের জন্যে ৬ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** তপন চরিত ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** গোসাঁই-বাগানের ভূত ৮

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

আবার মিলির ডায়েরি

প্রসাদ

আনন্দমেলায় পুরনো পাঠক-পাঠিকারা জানো, অনেকদিন আগে আমরা একটা অনুচিত কাজ করেছিলাম, আমরা মিলির ডায়েরি লুকিয়ে একটু পড়ে নিয়েছিলাম।

Was it wrong to read Milly's diary?

It was.

Why was it wrong to do so?

Because a diary is something private.

কিন্তু আমরা মিলির গল্প লিখছি তো, সেই জন্যে মিলি এবারে তার ডায়েরি আমাদের একটু দেখতে দিয়েছে। এখন আর দেখলে কোনো দোষ নেই। এসো, দু' একটা পাতা উলটে দেখি কী লিখেছে।

'Daddy and Mummy have gone to visit some friends. It's so dull at home when Daddy and Mummy are gone. I hate evenings like this. I wish they would take me with them when they go visiting. When I grow up and have children of my own, I'll never leave them alone in the evenings.

But I'll never have any children because I'll never marr·.

আরেক দিন:

We had such fun this evening. My friend Madhurima came with her parents. While we were looking at my picture-books, there was a ring at front door. I ran to open the door. My friend Rajarshi was standing on the steps. He said his parents were visiting the house next door. He had no friends there, so he had come over to our house.

So we had a little party, Madhurima, Rajarshi and I. We had such nice games, hide-and-seek, blindman's buff, cops and robbers. Madhurima, called Lalli, is a clever girl, it's very hard to find her when she's hiding. Rajarshi

called Boombi, is very smart, too. He knows where to look when people are hiding.

We were having a wonderful time when it was time for Lalli and Boombi to go.

* * *

যে-সব ধরনের বাক্য মিলির ডায়রিতে এবার দেখলাম, তা আমরা আগেও অনেক পেয়েছি। এখন আরেকবার সেগুলো ঝালিয়ে নাও। যেমন ধরো:

a) Daddy and Mummy have gone out.

b) We had fun this evening.

c) We were having a wonderful time.

এই রকম আলাদা আলাদা তিন ধরনের বাক্য তোমরাও লেখো। তারপর, নীচে যে বাক্যটা দিলাম, সে-রকম বাক্য যতগুলো পারো লেখো:

While we were looking at my picture books, there was a ring at the front door.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

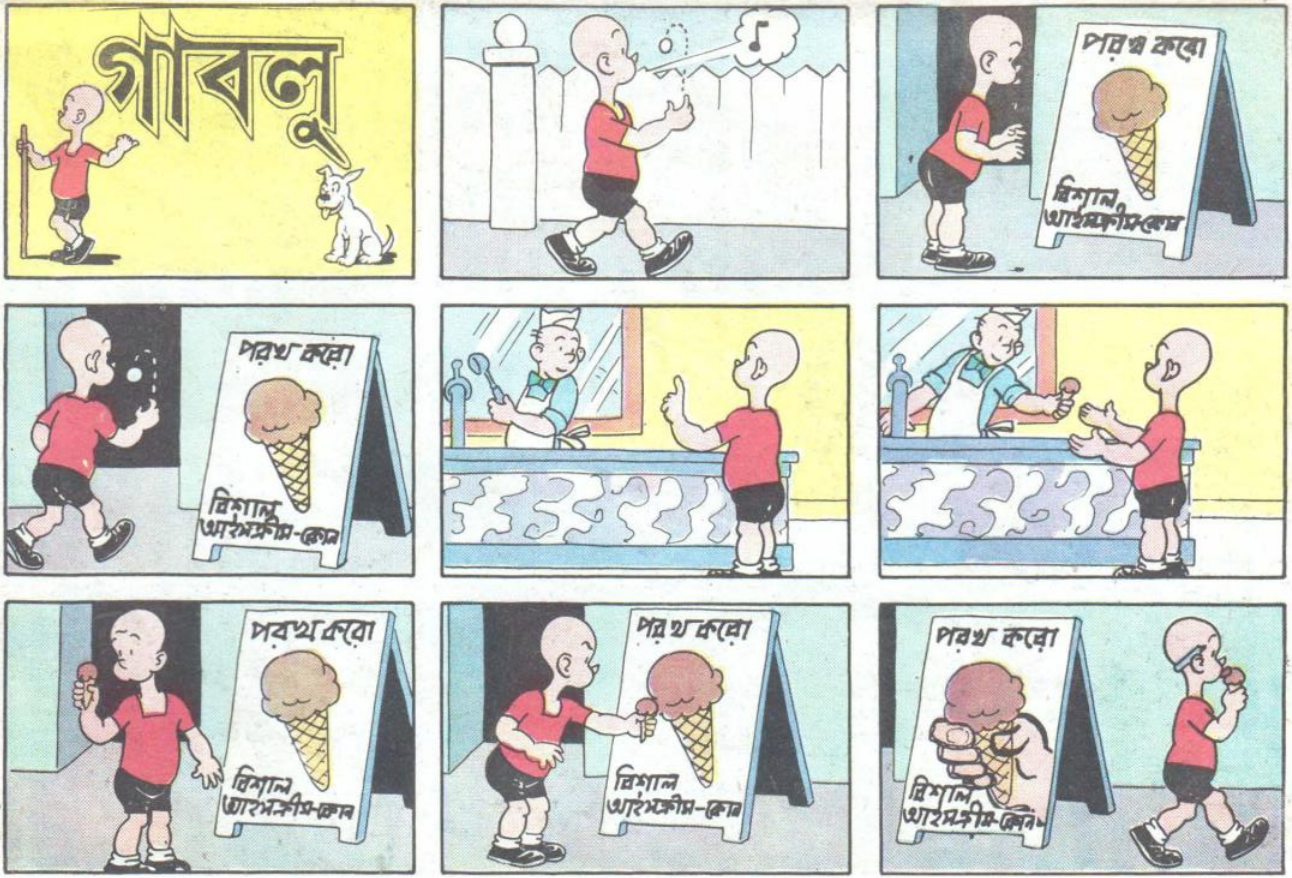
গাবলু
পরখ করো
বিশাল আইসক্রীম-কোন
পরখ করো
বিশাল আইসক্রীম-কোন
পরখ করো
বিশাল আইসক্রীম-কোন
পরখ করো
বিশাল আইসক্রীম-কোন
পরখ করো
বিশাল আইসক্রীম-কোন

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের (মেন) প্রধান শিক্ষক কী বলেন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলের শঙ্কর ঘোষ লেনে সুপ্রাচীন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, মেন। ১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এই স্কুলে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। বর্তমানে প্রাইমারি ও হায়ার সেকেন্ডারি

বিভাগ সহ এই স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় বারোশো।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুলের পাসের হার শতকরা ৮০। ১৯৭৯ সালে ৫০ জন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৪০ জন পাস করেছে। ১১ জন প্রথম বিভাগে, ১৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং বাকিরা তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে। প্রায় প্রতি বছরই এই স্কুলের ছাত্ররা জাতীয় মেধা বৃত্তি পায়।

প্রধান শিক্ষক শ্রীঅজিতকুমার সেন। তাঁর বিষয় বাংলা। শ্রী সেন ৩৪ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। তিনি সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক হয়েছেন।

কথা প্রসঙ্গে পাক্ষিক আনন্দমেলা সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক বললেন, "পাক্ষিক আনন্দমেলা শুধু আনন্দই দেয় না, শিক্ষার খোরাকও যোগায়। খেলাধুলো ছেলেরা এমনিতেই ভাল বাসে, পাক্ষিক আনন্দমেলা পড়ে তারা খেলাধুলোর বিষয় অনেক কিছু জানতে পারে। সেই সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে লেখাপড়ার বিষয়েও অনেক কিছু জানতে পারে।''

"কী ভাবে উত্তর লিখলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক বললেন, "ভাল নম্বর পেতে গেলে উত্তর নির্ভুল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। হাতের লেখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, বানান নির্ভুল হওয়া চাই। অঙ্কন-বিদ্যাতেও পারদর্শী হতে হবে। কারণ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিদ্যাটি খুব কাজে লাগে।"

"কী ভাবে পড়লে সাধারণ ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল ফল করবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক বললেন, ''সাধারণ ছাত্রদের পাঠ্যবই ভাল করে পড়ার দিকে জোর দিতে হবে। নিয়মিত স্কুলে আসতে হবে এবং ক্লাসে যে কাজ দেওয়া হয় তা করতে হবে। ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়াকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

"ভাল ছাত্ররা কী ভাবে পড়লে পরীক্ষায় আরও ভাল ফল করবে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী সেন বললেন, "ভাল ছাত্রদের পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের বই পড়তে হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

''পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয় কী ভাবে পড়লে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায়?"

"ইংরেজিতে কথাবলা রপ্ত করার চেষ্টা করতে হবে। সেই সঙ্গে বানান ও উচ্চারণ

যাতে শুদ্ধ হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। কিছু বাইরের ইংরেজি বইও পড়া উচিত। বাংলাতে ভাল নম্বর পেতে গেলে শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হবে এবং বাইরের বই পড়ার দিকে জোর দিতে হবে। হাতের লেখা ভাল করা দরকার। রচনা ও গল্প লেখার ওপর জোর দিতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে নিজস্ব একটা রচনাভঙ্গি গড়ে ওঠে।

"অঙ্কে বাড়ির কাজ নিয়মিত করলে পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যাবে। অবসর সময়ে অঙ্কের নানারকম খেলাও খেলা যেতে পারে। ভৌতবিজ্ঞানে ও জীবন-বিজ্ঞানে শুধু বই মুখস্থ না করে চিত্রের সাহায্যে সব কিছু ভাল করে বোঝা দরকার। স্কুলে যে প্র্যাকটিক্যাল করানো হবে বাড়িতে সেটির অনুশীলন করলে ভাল হয়। নিজের হাতে ছবি আঁকলে বিষয়গুলি সহজেই মনে থাকবে।

"ভূগোলে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। ম্যাপ আঁকার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ইতিহাসেও শিক্ষামূলক ভ্রমণ খুব কাজে আসে। ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার দিকে বেশি জোর দিতে হবে। কারণ, বর্তমান পরীক্ষায় ছোট-ছোট অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন আসে। কর্মশিক্ষায় হাতে-কলমে কাজ না শিখে শুধু বই পড়লে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে না। শারীর-শিক্ষায় যে ব্যায়াম এবং আসন স্কুলে শেখানো হয় সেগুলি বাড়িতেও অনুশীলন করা দরকার।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

দুটো সেকশন মিলিয়ে ফার্স্ট হয়ে নাইন থেকে টেনে উঠেছে অরুণকুমার রায়। কৈলাস বোস স্ট্রীটে থাকে। বয়স পনের। চতুর্থ শ্রেণী থেকে এই স্কুলে পড়ছে অরুণ। এই বছরই প্রথমবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। গৌতম গুঁইয়ের সঙ্গেই এ বছর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বেশি হয়েছে।

অরুণের বাবা ব্যবসায়ী। অরুণ সকালে চার ঘন্টা এবং সন্ধেবেলা পাঁচ ঘন্টা পড়ে। ছুটির দিন দুপুরে দু'ঘন্টা অঙ্ক কষে। বই পড়ায় এবং প্রশ্নের উত্তর লেখায় প্রায় সমান-সমান সময় দেয় সে। বাড়িতে বিজ্ঞান ও অঙ্ক পড়াবার জন্যে গৃহশিক্ষক আছেন। বাবা মাঝে মাঝে বাংলা দেখে দেন। স্কুলের মাস্টারমশাইরা পড়াশোনার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেন তাকে।

গণিত অরুণের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। বড় হয়ে অরুণ ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়। পড়াশোনা ছাড়া গল্পের বই পড়তে ও খেলতে ভালবাসে অরুণ। সত্যজিৎ রায়ের লেখা গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে অরুণের খুব ভাল লাগে। এছাড়া ক্যারম ও ক্রিকেট খেলতেও খুব ভালবাসে।

অরুণ জানাল, সে ইংরেজিতে একটু দুর্বল। সেইজন্য গ্রামার বেশি করে পড়ে। বাংলা পাঠ্যবই প্রথমে পড়ে নেয় তারপর তার

থেকে প্রশ্নের উত্তর লেখে। অঙ্কে সবচেয়ে বেশি সময় দেয় সে। বিজ্ঞানে প্রশ্নোত্তর লেখে। ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সন-তারিখ মুখস্থ করে, ভূগোল বুঝে পড়ে এবং ম্যাপ আঁকে।

পাক্ষিক আনন্দমেলার খেলাধুলো এবং প্রধান শিক্ষক ও ফার্স্ট বয়ের সাক্ষাৎকারের বিভাগ দুটি সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে অরুণের।

বাঘা

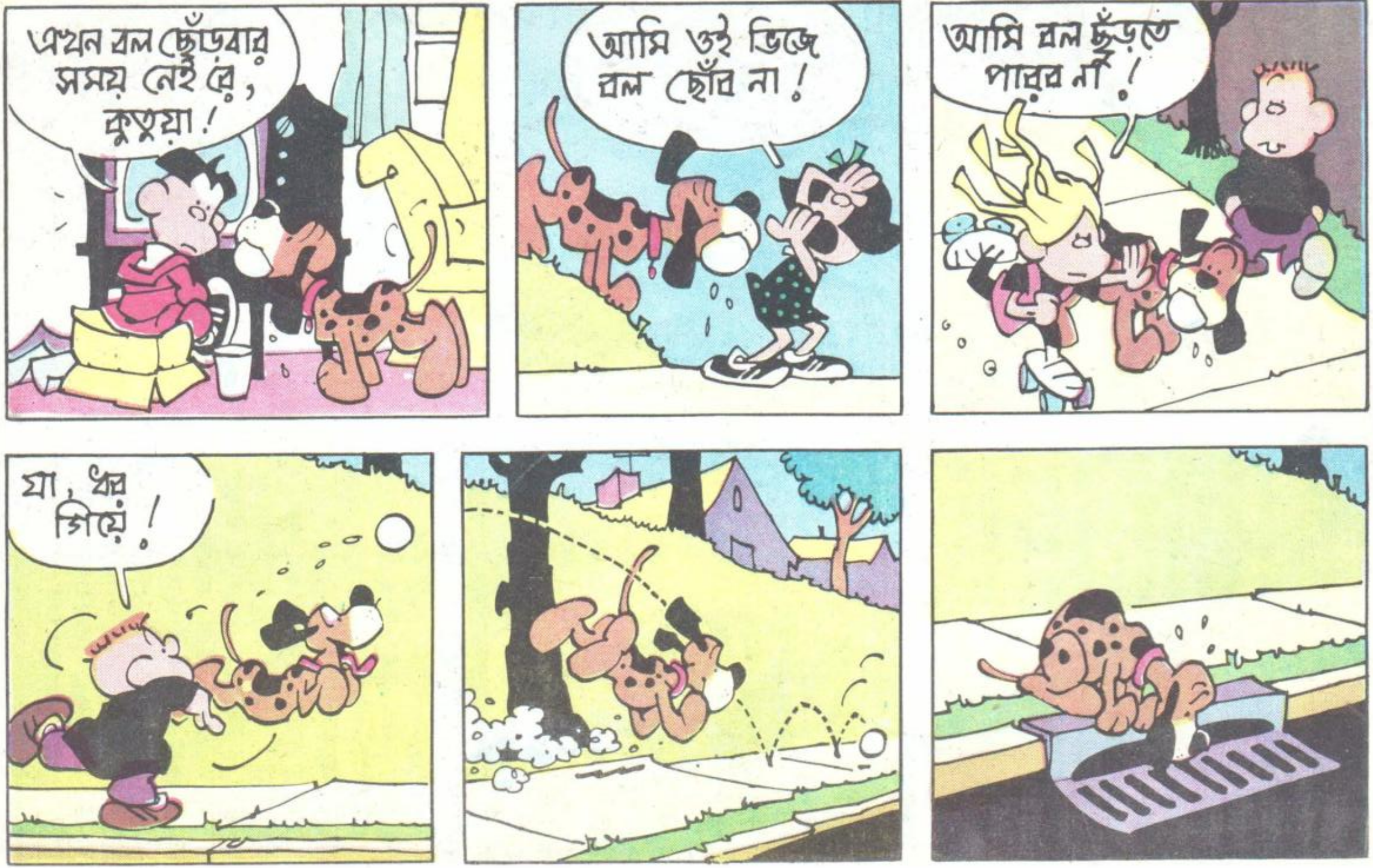

গাবলু
সুলুপ! সুলুপ!
সুলুপ! সুলুপ!
দুধ

আঁকো

জন্তু-জানোয়ার ঃ হাতি

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতি ধরার ফাঁদ কিন্তু ঐ চৌকোতেই। এবার লক্ষ করো কয়েকটা চৌকোর মধ্যে হাতি ধরা পড়েছে। স্পষ্ট করার জন্য আসছে-বার নজর রাখো।

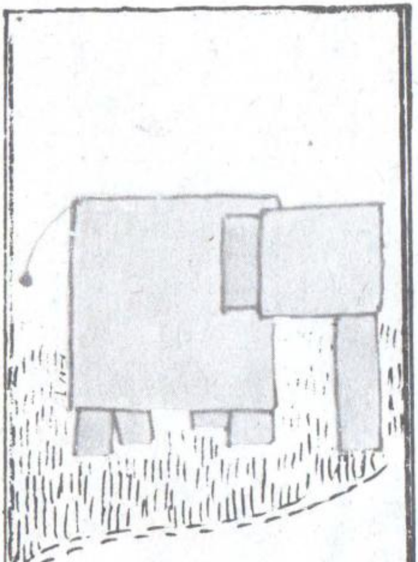

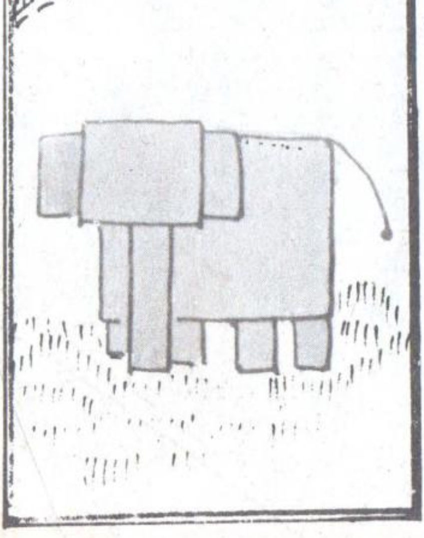

শেখো

কাগজের খেলনা ঃ পিরামিড

কারিগর

চৌকো বোর্ডের ওপর কোনাকুনি করে একটি চৌকো এঁকে নাও (নমুনা—ক+খ+গ+ঘ)। এবার ঐ কোনাকুনি করে বসানো চৌকোকে চার ভাগে ভাগ করে নাও সমানভাবে। ত্রিভুজ ১ আর ২-এর মাঝখানে ঘ থেকে চ পর্যন্ত কাঁচি দিয়ে কেটে রাখো। ভাঁজ করার সুবিধের জন্যে ক+চ, খ+ক, খ+চ, চ+গ, আর ক+গ বাহুগুলোর ওপর আলতো নরুনের চাপে দাগ দিয়ে নিয়ে খ+৭+ঘ লাল অংশটি কেটে বাদ দাও। এখন ১নং ত্রিভুজের অংশটি ২নং ত্রিভুজের ওপর চাপিয়ে আঠা দিয়ে আটকানো হলে ৩নং আর ৪নং অংশগুলো ভাঁজ করে নীচে নিয়ে গেলেই পিরামিড হাতে পাবে।

জেনে রাখো—এ-কাজে খুব যত্ন করে মাপ না করলে কোনোদিন পরিচ্ছন্ন কাজ করতে পারবে না।

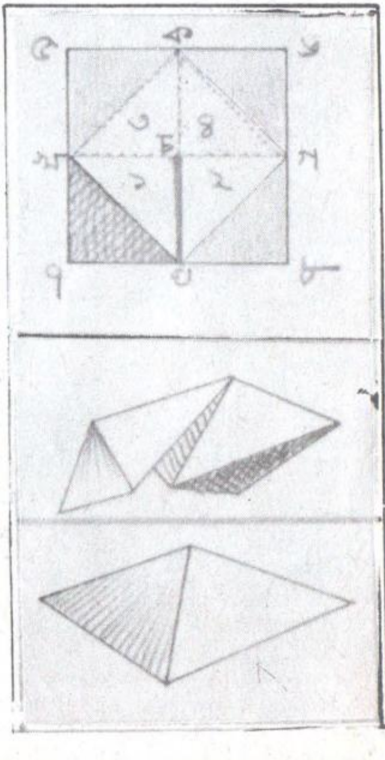

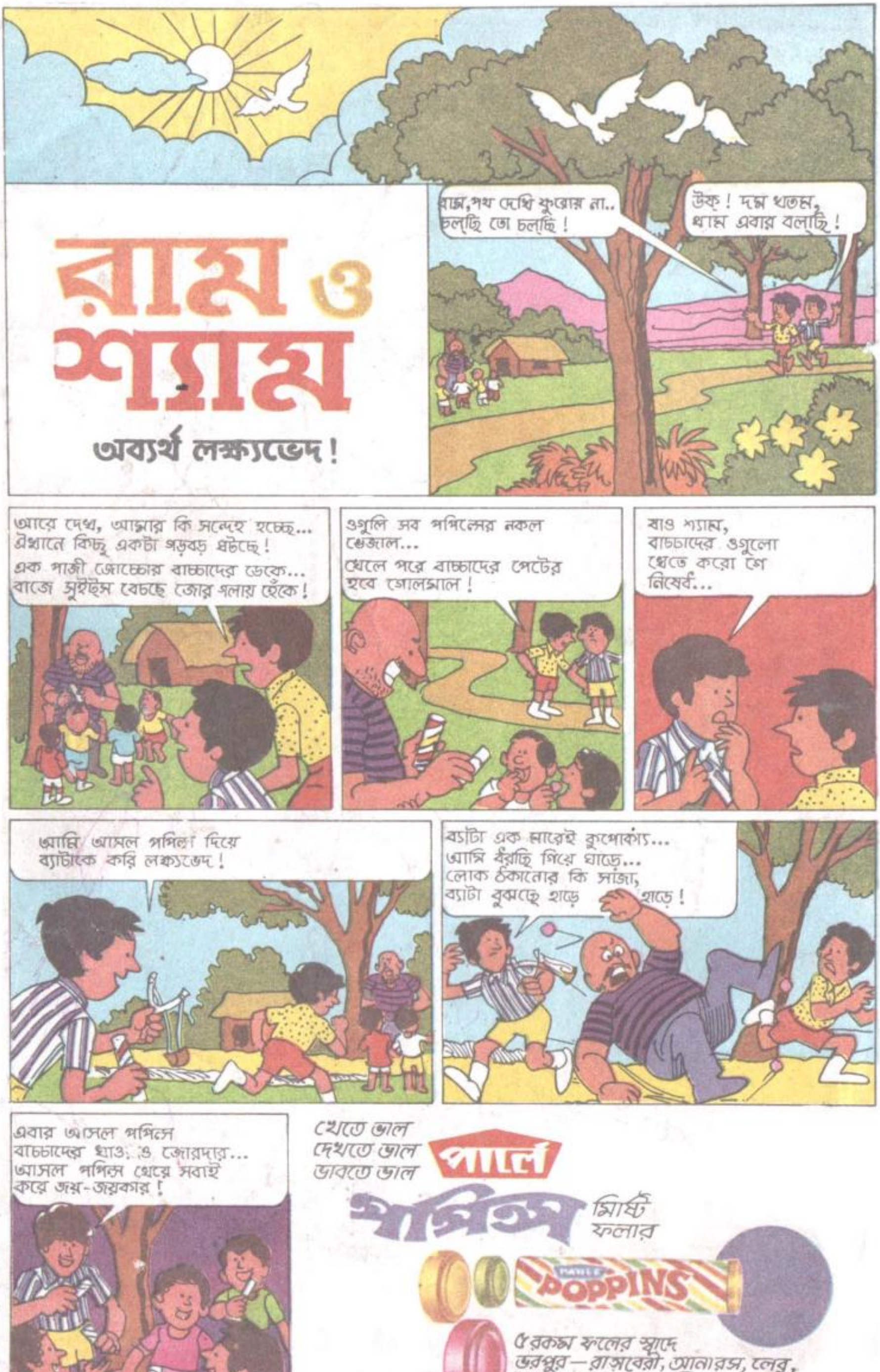
রাম ও শ্যাম
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ!
রাম, পথ দেখি ফুরোয় না.. চলছি তো চলছি!
উফ্! দম খতম, থাম এবার বলছি!
আরে দেখ, আমার কি সন্দেহ হচ্ছে... ঐখানে কিছু একটা গড়বড় ঘটছে! এক পাজী জোচ্চোর বাচ্চাদের ডেকে... বাজে সুইট্‌স বেচছে জোর গলায় হেঁকে!
ওগুলি সব পপিন্সের নকল ভেজাল... খেলে পরে বাচ্চাদের পেটের হবে গোলমাল!
যাও শ্যাম, বাচ্চাদের ওগুলো খেতে করো গে নিষেধ...
আমি আসল পপিন্স দিয়ে ব্যাটাকে করি লক্ষ্যভেদ!
ব্যাটা এক মারেই কুপোকাৎ... আমি ধরছি গিয়ে ঘাড়ে... লোক ঠকানোর কি সাজা, ব্যাটা বুঝছে হাড়ে হাড়ে!
এবার আসল পপিন্স বাচ্চাদের খাও ও জোরদার... আসল পপিন্স খেয়ে সবাই করে জয়-জয়কার!
খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স মিষ্টি ফলার
PARLE POPPINS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর—রাসবেরী, আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মুসম্বী।
everest/80/PP/309-bn.